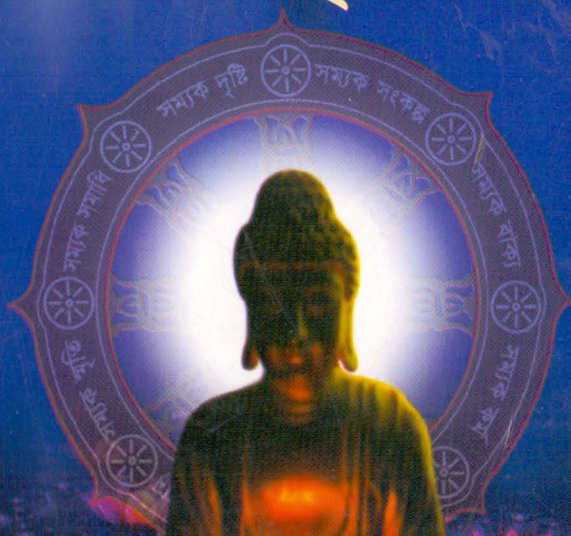


বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা



বোধিমিত্র বড়ুয়া



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Bodhijog Bhante

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা



গ্রন্থকার :
বাবু বোধিমিত্র বড়ুয়া

কুশলায়ন প্রকাশনা পরিষদ

জ্ঞানসেন বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রামণ প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র
শৈলেরঢেবা, উখিয়া, কক্সবাজার ।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

গ্রন্থকার :

বাবু বোধিমিত্র বড়ুয়া

পরিবেশনায় :

কুশলায়ন প্রকাশনা পরিষদ ।

প্রকাশকাল :

২রা নভেম্বর' ২০১৩ ইং, ২৫৫৭ বুদ্ধবর্ষ ।

শৈলেরচেবা চন্দ্রোদয় বৌদ্ধ বিহার ।

উখিয়া, কক্সবাজার ।

© গ্রন্থসত্ত্ব :

‘কুশলায়ন প্রকাশনা পরিষদ’ কর্তৃক সংরক্ষিত ।

সার্বিক সহযোগিতায় :

ভদন্ত জ্যোতি: রক্ষিত ভিক্ষু,

প্রসূনমিত্র বড়ুয়া,

সৌমিত্র বড়ুয়া ও

বিশ্বমিত্র বড়ুয়া ।

কম্পিউটার কম্পোজ :

শ্রী জ্যোতি প্রিয় ভিক্ষু ও

শ্রী জ্যোতি কল্যাণ ভিক্ষু ।

শ্রদ্ধা মূল্য : পরবর্তী প্রকাশনার জন্য ৮০ টাকা মাত্র ।

গ্রন্থকার পরিচিতি :

গ্রন্থপ্রণেতা সদালাপী, প্রিয়ভাষী, ‘শাসন সেবক’ উপাধি লাভ সক্ষমশালী উপাসক শ্রীযুক্ত বোধিমিত্র বড়ুয়া উখিয়ার শৈলেরচেবা গ্রামে ২ নভেম্বর ১৯৫৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত বাবু অধীন চন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা প্রয়াত শ্রীমতী ধীরা বালা বড়ুয়া। শিক্ষা জীবন : পালিটোল ও পালি কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে গুরুর অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাইভেটে এস.এস.সি পাশ ১৯৬৯ সালে। পরবর্তীতে বি.এ ও এল.এল.বি পাশ করেন। ধর্মীয় সুও ও অভিনয় উপাধি উত্তীর্ণ করেন। তিনি শৈলেরচেবা গ্রামের প্রথম প্রাইভেট ও প্রথম সরকারী কর্মকর্তা। চাকুরী জীবন : জীবনের প্রথমে উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ও উখিয়া আনন্দ পালি কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৪ সালে কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ২০১০ সালের ১লা নভেম্বর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক কার্যক্রম : শিক্ষাকালীন অবস্থায় রাজাপালাং আদি বিহার সান্নিধ্য তীর্থস্থান কমিটির সম্পাদক, পাতাবাড়ী আনন্দ ভবন বিহার পরিচালনা কমিটির কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ, কক্সবাজার বাহারছড়া বৌদ্ধ সেক্রেটারি ও বিহারের উন্নয়ন জোরালো ভূমিকা পালন করে। বৌদ্ধ মৈত্রী সংঘ কক্সবাজারের সেক্রেটারি, কৃষি প্রচার সংঘ কক্সবাজার অঞ্চলের সেক্রেটারি, ভোলা বৌদ্ধ সামাজিক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ বুডিষ্ট ফেডারেশন কক্সবাজার ভোলা সভাপতি, বৌদ্ধ বিহার কমিটির সেক্রেটারি, জ্ঞানসেন বৌদ্ধ ঐতিহ্য শ্রীমন্ত শিশুশিক্ষা ও সামান্য কল্যাণ সভাপতি, জ্ঞানসেন পালি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। আনন্দ শৈলেরচেবা বৌদ্ধ বিহার কমিটির প্রধান সমন্বয়কও তিনি। ধর্মীয় কার্যক্রম : ১৯৯৯ সালে শৈলেরচেবা চন্দ্রোদয় বৌদ্ধ বিহার দু’তলা ভবন সম্পূর্ণ নিম্ন অটো নির্মাণ সহ বিভিন্ন বিহার উন্নয়ন ও নির্মাণে সহযোগিতা করেছেন। বৌদ্ধ সমাজে সমাদৃত তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ : দৈনিক বৌদ্ধ বার্তা, বড়ুয়া বৌদ্ধদের আশীর্বাদ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট, ষষ্ঠ থেকে দশম পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম সহায়ক গল্প, দারভে বাইশ দিন (অপ্রকাশিত), বৌদ্ধ ধর্মে সৃষ্টি (অপ্রকাশিত), কর্মফল ন্যতিক মঙ্গল (অপ্রকাশিত) সহ বহু প্রবন্ধরচনাকার তিনি। বর্তমান জীবন : বানসায়াক ও সামাজিক কার্যক্রমে জড়িত। ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ ও লেখালেখিতে দিন যাপন।

শাসন ও সমাজের কল্যাণতরে ভবিষ্যতেও তাঁর এরূপ অয়াস ও অবদান অব্যাহত থাকুক, এ কামনায় পুণ্যদান করছি।

ভদ্রান্ত জ্যোতি: রক্ষিত ভিক্ষু

শৈলেরচেবা চন্দ্রোদয় বিহার, উখিয়া।

উৎসর্গ

উখিয়ার পাতাবাড়ী আনন্দ ভবন বিহারের প্রাক্তন
অধ্যক্ষ, উখিয়ার জনগণের শিক্ষার
আলোকবর্তিকা, সঙ্ঘর্ষ প্রচারক ও সমাজ
সংস্কারক, যিনি পুত্রবৎ স্নেহে আমার শিক্ষা দীক্ষার
সার্বিক ব্যবস্থা করেছিলেন, মদীয় গুরুদেব,
পরলোকগত শ্রীমৎ জ্ঞানসেন মহাশয়ের
মহোদয়ের করকমলে -

এবং

মদীয় স্বর্গীয় পিতা শ্রীযুক্ত বাবু অধীন চন্দ্র
বড়ুয়া ও মাতা শ্রীমতি ধীরাবালা বড়ুয়া'র
পারলৌকিক উর্দ্ধগতি নির্বাণ কামনায় এ গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করলাম ।

ইতি -

সেবক

বোধিমিত্র বড়ুয়া

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

- লেখকের কথা

পৃথিবীর সকল ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক অভিনব দর্শন। মানুষ যখন ধীরে ধীরে জ্ঞান-বিকাশের জগতে প্রবেশ করে তখন তাদের মধ্যে নব নব চিন্তা ধারা বিকাশ হয়। প্রাচীন কালের তথা বুদ্ধপূর্ব কালে আমরা ভারতবর্ষে প্রাচীন বেদ বেদান্তের জ্ঞান-দর্শন সম্পর্কে ধারণা পাই। তা' আজ থেকে প্রায় চার-পাঁচহাজার বছর আগের কথা। তখন কিন্তু ইউরোপ আফ্রিকা তথা আমেরিকার কোথাও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হত বলে জানা যায় না। তাই ভারতীয় উপমহাদেশেই মানব জগতের চিন্তন মননের তথা ধ্যান সাধনার ফসল প্রাচীন বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ তথা তৎপরবর্তী বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ও জৈনধর্মমতকেই প্রাচীন কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপান্তরূপে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীকালে কনফুসিয়াস মতবাদ, ইহুদী খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রচার হলেও, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের সাথে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য।

জীব ও জগৎ নিয়ে মানুষের চিন্তা স্মরণাতীত কাল থেকে। কিভাবে এবং কার দ্বারা এ বিশ্ব সৃষ্টি এবং পরিচালিত এ নিয়ে অনিসন্ধিৎসু মনের আকুতির শেষ নেই। কালে কালে ধর্মপ্রচারকবৃন্দ, দার্শনিকবৃন্দ এবং বৈজ্ঞানিকবৃন্দ বিভিন্ন মত ও যুক্তি খাড়া করেছেন। কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম প্রচারক মহামতি গৌতমবুদ্ধ যে বিস্ময়কর মতবাদ প্রচার করেছেন, তা শুধুমাত্র প্রজ্ঞাবান ও গবেষকদের বোধগম্য। বুদ্ধের এ মহান যুক্তি ও

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

চিন্তা চেতনার প্রচার করাই আমার মূখ্য উদ্দেশ্য । জগৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে বৌদ্ধতত্ত্বের মূল বক্তব্য কি - তা একান্ত সরলভাবে আলোচনা করাই আমার লেখার উপজীব্য বিষয় ।

আমার এ গ্রন্থের উপর বৌদ্ধ দৃষ্টিতে সারগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন শৈলেরঢেবা চন্দ্রোদয় বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ এবং জ্ঞানসেন ভিক্ষু-শ্রামণ প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক শ্রদ্ধেয় কুশলায়ন থের । তাঁর এ মহামূল্যবান ভূমিকা প্রদানের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি । বইটি প্রকাশে প্রেসের সকল দায়িত্ব পালন করার জন্য ভদন্ত জ্যোতি রক্ষিত ভিক্ষুকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । আর কম্পোজের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ভদন্ত জ্যোতি প্রিয় ও জ্যোতি কল্যাণ ভিক্ষুকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

জ্ঞান পিপাসু মনের কিছুটা খোরাক হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব ।

ইতি-

বোধিমিত্র বড়ুয়া

পাহাড়তলী, কক্সবাজার সদর ।

ভূমিকা

‘বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা’ গ্রন্থের লেখক একজন বৌদ্ধ চিন্তাবিদ, তিনি দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে সভা-সমিতিতে তথ্য ও তত্ত্বমূলক বক্তৃতা, এছাড়া কয়েকটি ধর্মীয় বই (বুদ্ধ বন্দনা ও বৌদ্ধ বিধি, বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্য উপযোগী গাইড) এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিনে অর্ধশতাধিক প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞ পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছেন। বর্তমান তাঁর লেখা ‘বৌদ্ধ ধর্মে সৃষ্টিকর্তা’ গ্রন্থটিও একটি গবেষণা মূলক গ্রন্থ। অধিকন্তু বৌদ্ধিক চিন্তাধারায় সাদা-মাটা ধর্মীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত একজন বৌদ্ধ উপাসক। শিক্ষকতা জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সমাজ ও সদ্ধর্ম উন্নয়নে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের থেরবাদার্শের আলোকিত প্রতিষ্ঠান ‘জ্ঞানসেন বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রামণ প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমার ব্যক্তিগত জীবনের একজন পরম হিতৈষী ও মতাদর্শীও বটে। তিনি অত্র গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে আলাপ আলোচনায় জানতে পারেন যে, বৌদ্ধদের মাঝেও ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। সাধারণ জনের মধ্যে অনেকের ধারণা ভগবানও আমাদের সৃষ্টিকর্তা। এ বিষয়গুলি তিনি দীর্ঘকাল চিন্তা করে আসছেন। তাই স্ব-জাতীয়দের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বর সম্পর্কিত মৌলিক দেশনা (বক্তব্য) উপস্থাপন এবং বৌদ্ধ দর্শন

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

ও অন্যান্য দর্শনের সাথেও তুলনামূলক আলোচনা করে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। তাই লেখক বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ের উপর তিনি প্রামাণিক (যৌক্তিক) আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম অধ্যায়ের প্রাক্ আলোচনা হতে শুরু করে প্রাচীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, বৌদ্ধ দর্শন ও অন্যান্য দর্শনের পার্থক্য, জগৎ ও পরলোক সম্পর্কে বুদ্ধকে বিভিন্ন জনের প্রশ্ন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে প্রশ্নের উদ্বেগ হয় (লেখকের একান্ত চিন্তা প্রসূত), জগৎ আগে না ঈশ্বর আগে, বৌদ্ধমতে সৃষ্টিকর্তা- অবিদ্যা ও তৃষ্ণা, নাম-রূপ, সংসারে সংক্রমণ বা হেতু প্রত্যয় ধর্ম, জগতের ধ্বংস ও পুনর্গঠন এবং শেষ বক্তব্য। এই ধারাবাহিক আলোচনায় লেখকের যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় পরিষ্কৃত হয়েছে। এখানে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের দার্শনিক বিচার এবং বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিতে ‘ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা’ আছে কি নাই? উক্ত বিষয়ে তিনি উভয় দিক বিচার করে বহু তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তাঁর গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন জগৎ সৃষ্টি, ধ্বংস ও পরিচালনায় কারো অস্তিত্ব স্বীকার প্রজ্ঞা সমর্থিত নয়, এটা একটি অবিদ্যা প্রসূত কাল্পনিক ধারণা মাত্র।

লেখক ‘বাবু বোধিমিত্র বড়ুয়া’ তাঁর লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা রচনার জন্য আমাকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রার্থনা করেছেন, অথচ সে যোগ্যতা আমার নেই। যেটি হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বের একটি অমীমাংসিত বিষয় ঈশ্বরতত্ত্ব। যদিও বৌদ্ধ ধর্মে বিষয়টি আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে ঈশ্বরবাদীদের দম্ভ চূর্ণ করে দিয়ে বুদ্ধ ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে মিথ্যা, কাল্পনিক,

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

ভ্রান্ত মত বা বাল (মূর্খ) ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে এখনও অনেকেই তা বিশ্বাস করে আসছে। তাই বলছি এমন একটি বিষয়ের ভূমিকা রচনা করে কৌতূহলী পাঠক সমাজের কতটুকু পাঠোপযোগী করে উক্ত বিষয়ের রসবোধ সৃষ্টি করতে পারব সে বিশ্বাস আমার নেই। তবুও গবেষকের শ্রদ্ধার আধিক্য রক্ষায় ভূমিকা লিখতে বাধ্য হয়েছি। আমি এখানে লেখকের উল্লেখিত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বৌদ্ধ ধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করছি।

বৌদ্ধ ধর্ম সাকার বা নিরাকার কোন সর্বশক্তিমান (ঈশ্বরের) উপর নির্ভর করে না। মানব তথা সকল প্রাণীর দুঃখ অপনোদনের জন্য মানবপুত্র সিদ্ধার্থ ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে জগতে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। তাই বৌদ্ধধর্ম মানবধর্ম এবং (মানব) দুঃখমুক্তির ধর্ম। জগতে যত ধর্ম স্বীকৃত তাঁদের সকলের পরিচিতিতে দেখা যায়, কেহ ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ, কেহ ঈশ্বরের পুত্র, কেহ অবতার (যুগে যুগে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত)। তাঁরা ঈশ্বরের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করেন। অতএব এসব ধর্ম ঈশ্বর নির্ভর এবং এদের আরম্ভ অলৌকিক। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম সিদ্ধার্থ গৌতমের সম্পূর্ণ (স্বয়ং) অভিজ্ঞ লব্ধ প্রজ্ঞা প্রধান এবং বৈজ্ঞানিক নীতিতে জড়াজড় বিশ্বকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। সে নীতি হচ্ছে বুদ্ধের এক অভিনব আবিষ্কার-প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতি (জন্ম-মৃত্যু রহস্য, জগতের সৃষ্টি প্রলয়ের কারণ, ভবচক্র বা সংসারচক্র)। বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তির মূলে কোন দেবতা বা ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তি নেই। তার কারণ হিসেবে প্রজ্ঞা প্রসূত এবং বিজ্ঞান সম্মত যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন তৎমধ্যে এ

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

‘কার্যকারণ’ নীতিই প্রধান। জগতে তিনিই একমাত্র নিরীশ্বরবাদ, অনাত্মবাদের দেশনা (বক্তব্য) উপস্থাপন করে মানুষের ভ্রান্ত ধারার গতি রোধ করে সম্যক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে (Hiibbert lecture, 4th ED p.29) রিস ডেবিডস্ বলেন— পৃথিবীর ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মে সর্বপ্রথম এমন এক মুক্তির বাণী ঘোষিত হয়েছে, যে মুক্তি প্রত্যেক মানুষ ইহলোকে জীবদ্দশাতেই অর্জন করতে সক্ষম। এর জন্য ঈশ্বর কিংবা ছোট বড় কোন দেবতার বিন্দুমাত্রও সহায়তা প্রয়োজন হয় না। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন ভবিষ্যতের মহাজাগতিক ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন— অনাগতের মহাজাগতিক ধর্ম ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে অতিক্রম করবে এবং মতবাদের গোঁড়ামি ও ঈশ্বরমূলক ধর্ম বর্জন করবে। ইহা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সকল বস্তুর অভিজ্ঞতা হতে উৎপন্ন হবে।

বৌদ্ধ ধর্ম এ বর্ণনার উত্তর দিয়ে থাকে। (World buddhism) ঈশ্বরবাদীদের ধারণা যদি একজন নিয়ন্ত্রক বা স্রষ্টা না থাকেন, তবে কিভাবে জগৎ ও জীবের সৃষ্টি হয়েছে? সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত এত বড় বিশ্ব, বিচিত্র প্রাণী জগৎ, বিচিত্র উদ্ভিদ জগৎ, বাতাস, পানি, অগ্নি তথা বিশ্ব ও বিস্ময়কর দ্রব্যাদি কিভাবে সৃষ্টি হল? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন। বুদ্ধ কিন্তু কার্যকারণ নীতিতে অবিদ্যা ও তৃষ্ণাকে সৃষ্টির জনক বলেছেন, তাই তিনি জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, ইম্পিত বস্তুর অলাভে দুঃখ এবং সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) দুঃখ হতে পরিত্রাণের

জন্য কার্যকারণ নীতির ভিতর দিয়ে অবিদ্যা ও তৃষ্ণা ক্ষয় করার আহ্বান করেছেন। এবং বলেছেন ‘এহি পস্ম’ এই মূলতত্ত্ব তোমরা অবগত হও ও গভীর জ্ঞানে দর্শন কর। ইহার মধ্যে জন্ম-মৃত্যু রহস্য খুঁজে পাবে। অবিদ্যা-তৃষ্ণার ক্ষয় হলেই এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হবে। এ প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বংকিম চন্দ্র সেন লিখেছেন – ‘ঈশ্বর কে না মানা বা ভগবানকে অস্বীকার করা এই পথে হইতেছে কিনা এই প্রশ্ন অনেকটাই অবাস্তব। ভগবান বা ঈশ্বরকে মানিয়া লইবার মোহে যদি তৃষ্ণাকে জয় করা না যায় কিংবা কামনা বাসনার কূট গ্রন্থিগুলি আমরা কাটিয়া বাহির হইতে না পারি, তবে ধর্মের নামে আগাদের পক্ষে আত্ম প্রবঞ্চনা করা হইবে। কথায় কথায় ভগবানের দোহাই দিলেও আমরা সেক্ষেত্রে জড় জীবনের দুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইব না’। (জগৎ জ্যোতি-১০৮ পৃ: কোলকাতা)।

প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিতে (কার্যকারণ নীতি) (কর্মভব ও উৎপত্তিভব) বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ভবের (কর্মের) প্রত্যয়ে জীবগণের জন্ম হয়ে থাকে। অবিদ্যা-তৃষ্ণা ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত এই ভবচক্রের ভিতর দিয়ে পঞ্চ শুদ্ধাবাস লোক ব্যতীত অবশিষ্ট ২৬টি ভবে জীবগণ আবর্তিত হচ্ছে। ভগবান তোদেয়া পুত্র শুভ মানবকে উপলক্ষ্য করে চুলকর্ম বিভঙ্গ সুত্রে কর্মের পরিণতির বিস্তৃতি ব্যাখ্যা ব্যক্ত করেছেন। কেন মানুষের মধ্যে কেহ হীন-উৎকৃষ্ট, কেহ অল্পায়ু-দীর্ঘায়ু, কেহ রোগী-নীরোগী, কেহ সুশ্রী-কুশ্রী, কেহ সবল-দুর্বল, কেহ ধনী-দরিদ্র, কেহ উচ্চকূলজাত-নীচকূলজাত ও কেহ জ্ঞানী (পণ্ডিত)-অজ্ঞানী (মূর্খ) হয়। ইহার কারণ (প্রত্যয়) হিসেবে বলেছেন—

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

“কম্মস্সকা মানবসত্তা, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণা, কম্মং সত্তে বিভজতি যদিদং হীনপ্প নীতায়” অর্থাৎমানব সত্ত্ব মাত্রই আপন কর্মের অধীন, তারা সেই কর্মের দায়াদ বা উত্তরাধিকারী, কর্মানুসারে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কর্মই বা বন্ধু বা আজীবন-আমরণ বা নির্বাণ সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত মিত্ররূপে কাজ করে। সেই কর্মই তার প্রতিশরণ (আশ্রয়) স্বরূপ, কারণ কর্ম সত্ত্বগণকে হীন-উৎকৃষ্টরূপে বিভক্ত করে থাকে। অতএব এখানে কাল্পনিক কোন শক্তি বা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নেই।

বুদ্ধের সমসাময়িক কালে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা (ঈশ্বর) বিশ্বাসী অনেক তাত্ত্বিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাথে আলাপ-আলোচনায় বা প্রশ্নে উত্তরে তাদের কাছ থেকে বুদ্ধ জানতে পেরেছিলেন, আপনারা যাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা ব্রহ্মা মানেন, তাকে (ঈশ্বর) আপনারা দেখেছেন অথবা আপনাদের পূর্বসূরী কেহ তার (ঈশ্বর) সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। যেই কারণে তাকে (ঈশ্বর) বিশ্বাস করেন। উত্তরে বলেছিল—কেহ তাকে দেখেনি এবং তার সাক্ষাৎও কেহ পায় নি। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছিলেন—এটা একটা ভ্রান্ত কল্পনা ও মিথ্যা বিশ্বাস মাত্র। বুদ্ধ আরও বলেন, আপনারা যাকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মা হিসেবে মনে করেন তিনিও অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মার অধীন। ঈশ্বর নিত্য, ধ্রুব, যোনিহীন নহেন। তিনি এই সৃষ্টিকে রচনা ও ধ্বংস করে না। বরঞ্চ অপর প্রাণীগণের ন্যায় তিনিও জন্ম-মৃত্যুর অধীন। অগণিত দেবতাদিগের মধ্যে তিনি কেবল একজন দেবতা বিশেষ।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরবাদ খন্ডনের জন্য বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে ব্রহ্মলোকের বক মহাব্রহ্মার সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘ব্রহ্মলোকই নিত্য, ধ্রুব, স্বাশত, অপরিবর্তনশীল, অজর, অমর ও ব্রহ্মলোক হতে লোকান্তরে গমন বা নির্বাণ নামক কোন পদার্থ নেই’ এক সময় বক মহাব্রহ্মার এইরূপ মিথ্যা ধারণা জন্মেছিল। বুদ্ধ বক ব্রহ্মার মনোভাব অবগত হয়ে তাঁর অতীত বিষয় চিন্তা করে জানতে পারেন, বক ব্রহ্মা কোন প্রাচীন কালে পরপর তিন বার তপস্বী ছিলেন। একবার মরুকান্তারে তপস্যাকালে দিক্ ভ্রান্ত এক ব্যবসায়ীর পঞ্চশত গরুরগাড়ী ও সমপরিমাণ প্রাণীর জীবন রক্ষার উপায় করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার এনি নামে এক নদীর তীরে তপস্বী হয়ে অবস্থানকালে ডাকাত দলের দ্বারা আক্রান্ত প্রত্যন্ত গ্রামের বহুলোকের জান-মালের রক্ষা করেছিলেন। আরেকবার গঙ্গাতীরে তপস্যা করতেন, সেই সময় নদীতে আনন্দোৎসবরত নাগরাজ কর্তৃক আক্রান্ত বহুলোকের প্রাণনাশ হতে রক্ষা করছিলেন। উপরোক্ত তপস্যা ও পুণ্যবলে বৃহৎফল (বেহুপফল) ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করে ৫০০ (পঞ্চশত) কল্প পরমায়ু ভোগ করে শুভকিঞ্ছ ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর হন। এখানেও ৬৪ (চৌষষ্টি) কল্প আয়ু শেষে অভিস্র ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এ ব্রহ্মলোকের আয়ু ৮(আট) কল্প। উদ্ধতন ব্রহ্মলোকের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তিনি অভিস্র ব্রহ্মলোকে এসেই ভ্রান্ত ধারণা বশীভূত হয়। তাই ভগবান এক মূহূর্ত সময়ে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে উক্ত ব্রহ্মলোকে বক মহাব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। বুদ্ধকে দেখে বক মহাব্রহ্মা স্বাগতবচন উচ্চারণ করে বললেন— আসুন মারিস (মাননীয় মিত্র)! আপনি বহুদিন এখানে আসবার সুযোগ গ্রহণ করেননি।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

এ ধাম নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অজর, অমর । ইহার অবনতি ও ধ্বংস নাই । ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধতন অন্য কোন নিঃসরণ(গন্তব্যস্থান) নাই । তদুত্তরে ভগবান বককে বললেন— অহো! বক ব্রহ্মা দেখছি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়েছেন । যখন তিনি(বক) অনিত্যকে নিত্য, অশাস্বতকে শাস্বত, অশুদ্ধকে শুদ্ধ, চ্যুতকে অচ্যুত বলতেছেন ইত্যাদি, এ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোন লোক থাকলেও নাই বলতেছেন, তখন নিশ্চিত তিনি (বক) অবিদ্যা আচ্ছন্ন হয়েছেন । ইহা শুনে বক ভাবলেন, এই ব্যক্তি ইহা কি বলতেছে, আপনি ইহা বলতেছেন বলে বক নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন । যেমন কোন চোর দু-চার বার প্রহারে দুর্বল হয়ে বলে, আমি কি একাই চোর? অমুক চোর, অমুক চোর বলে সমস্ত সঙ্গীকে পরিচয় করিয়ে দেয়, সেইরূপ বকব্রহ্মাও ভগবানের প্রশ্নে ভীত হলেন এবং ব্রহ্মলোকের অন্যান্য সত্ত্বরা যে বকব্রহ্মার মতের সাথে একমত ইহা বুঝতে চেষ্টা করেন । ভগবান তাঁকে পরপর তিনবার মনুষ্যকুলের তপস্যা ও পুণ্য অর্জনের কাহিনী এবং তৎপ্রভাবে বৃহৎফল, শুভকিঞ্ছ ব্রহ্মলোকের জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, তিনি নিজের কৃত কর্ম স্মরণ করলেন এবং ভগবানের স্তুতি করলেন । ত্রিলোক শাস্তা ভগবান, বক ব্রহ্মা প্রমুখ দশ সহস্র ব্রহ্মার উপলক্ষে চতুরার্য্য সত্য ও পরমার্থ সত্য ব্যাখ্যা করে দেশনা করলে সকলের ভ্রান্ত ধারণা মুক্ত হয়ে বিমুক্ত বা অর্হৎ হয়েছিলেন । (বক জাতক, ঈশানচন্দ্র অনূদিত জাতক তৃতীয় খন্ড ও বৌদ্ধ দর্শন— রাহুল সাংকৃত্যায়ন)

বুদ্ধ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা (ইশ্বর) সম্পর্কে দীর্ঘ নিকায়ের কেবদ্ধ সূত্রে এইরূপ দেশনা করেছেন । “বহু পূর্বে জনৈক

ভিক্ষুর চিত্তে এই প্রশ্নের (পরিবিতর্কের) উদয় হয়েছিল, “চারি মহাভূত— পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ু ধাতু কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?” তিনি উক্ত চিত্ত বিতর্ক সমাধানের জন্য চতুর্মহারাজিক দেবগণের নিকট গমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন। চতুর্মহারাজিক দেবগণ তাঁকে বললেন, আমরা জানি না, আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত চারি মহারাজা আছেন, তাঁরা সম্ভবতঃ ইহা অবগত আছেন। এভাবে করে জনৈক ভিক্ষু ত্রয়স্বিংশ, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ ও তাঁদের অধিপতিগণের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। সকলে বলেছিল আমরা জানি না। ব্রহ্মাকায়িক নামক দেবগণ আছেন। ব্রহ্মাকায়িক দেবগণ সেই ভিক্ষুকে বললেন, ‘আমাদের অপেক্ষা বহু বড় জ্যোতিস্মান ব্রহ্মা আছেন, ‘তিনি আমাদের মহাব্রহ্মা বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা, ভূত ও ভবের শক্তিমান পিতা, সম্ভবতঃ তিনি জানেন’। ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মা (ঈশ্বর) এখন কোথায় আছেন? তাঁরা বললেন, আমরা জানি না তিনি কোথায় আছেন। অতঃপর অচিরে মহাব্রহ্মার (ঈশ্বরের) আবির্ভাব হল। ভিক্ষু মহাব্রহ্মার (মহান ঈশ্বর) সমীপে গমন পূর্বক তাকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করলেন। মহাব্রহ্মা (মহান ঈশ্বর) ভিক্ষুকে বললেন, হে ভিক্ষু! আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, পিতা”। দ্বিতীয়বার তিনি মহাব্রহ্মাকে বললেন, আপনি যেরূপভাবে নিজের বর্ণনা করলেন, ঐ বর্ণনা আপনার প্রতি যথার্থই প্রযোজ্য কিনা তা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতেছি ‘চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়’। এবারও মহাব্রহ্মা ভিক্ষুকে পূর্বের ন্যায় উত্তর প্রদান করলেন। তৃতীয়বারও ভিক্ষু মহাব্রহ্মাকে পূর্বের

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

ন্যায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন । তখন মহাব্রহ্মা ভিক্ষুর বাহু গ্রহন পূর্বক (দেব সভা হতে) এক প্রান্তে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে ভিক্ষু! ব্রহ্মকায়িক দেবগণের ধারণা যে এমন কিছুই নেই যা আমার অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত । এ কারণে আমি তাঁদের সম্মুখে কিছু বলিনি । হে মারিষ (মাননীয় মিত্র)! চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান আমিও অবগত নই । অতএব, হে ভিক্ষু! ইহা আপনারই দোষ, আপনারই ভুল হয়েছে যে, আপনি ভগবানের নিকট গমন না করে এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপরের নিকট গমন করতেছেন । আপনি ভগবান শাস্তার নিকট গমন করে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন! তিনি যেরূপ বলেন, সেরূপই গ্রহন করবেন ।

দীর্ঘনিকায়ের পাটিক বর্গের পাথিক সূত্রে (মল্লগণের প্রজাতান্ত্রিক অনুপ্রিয়াতে) বুদ্ধ ভার্গবগোত্রীয় এক পরিব্রাজকের সাথে ঈশ্বর, ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তা) সম্পর্কে এইরূপ আলোচনা করেছিলেন । ভগ্গব! বস্তু সমূহের প্রারম্ভ (সৃষ্টি) আমি অবগত আছি । এর চাইতেও অধিক আমার বিদিত । কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না । ইহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হয়ে আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না । কিন্তু ভগ্গব! কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা তাঁদের আচার্য-প্রাচার্য মতে ঘোষণা করেন যে, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার কর্তৃত্বের সিদ্ধান্তকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করেন । আমি তাঁদের নিকট গমন করে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা সত্যি কি ঈশ্বরের বা ব্রহ্মার কর্তৃত্বকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করতেছেন । এরূপে জিজ্ঞাসিত হলে, তাঁরা হ্যাঁ বলে স্বীকার করলেন । পুনঃ জিজ্ঞাসা করি আপনারা কিরূপে ঈশ্বরের

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

কর্তৃত্ব সঠিক ও যথার্থ বলে নির্ধারণ করেন। এর উত্তর দিতে তাঁরা সমর্থ না হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা (আমার কাছ থেকে জানতে চাইলে) করেন। তদনন্তর আমি তাঁদের এরূপ উত্তর দিলাম— ‘সুদীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় (ধ্বংস) প্রাপ্ত হয়। পুনরায় বহুকাল অতীত হলে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন হয়। ঐ সময় শূণ্য ব্রহ্ম বিমান (ব্রহ্মার যাতায়ত গৃহ) আবির্ভাব ঘটে। কোন সত্ত্ব আয়ুক্ষয় অথবা পুণ্যক্ষয়ে সেই শূন্য ব্রহ্ম বিমানে (আভাস্বর লোক হতে চ্যুত হয়ে) উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হয়ে থাকে, প্রীতি তার ভক্ষ্য হয়। বহুকাল একাকী অবস্থান করতে গিয়ে তার মনে অসন্তুষ্টি ও ভয়ের সৃষ্টি হয়। এই ভয় হতে সে অন্য প্রাণীর আগমন প্রত্যাশা করলেন। ঐ সময়ে অন্য জীবগণও আয়ুক্ষয় অথবা পুণ্যক্ষয়ে অন্য লোক হতে তার সঙ্গীরূপে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। যে সত্ত্ব (ব্রহ্মা) প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল সে এরূপ চিন্তা করলেন— ‘আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, বিজেতা, সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্বামী এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রাণীদের পিতা, আমার পরে যারা এসেছে তারা আমার সৃষ্ট। কারণ আমার প্রত্যাশায় ও কামনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করেছে। অতপর যারা পরে উৎপন্ন হয়েছে তারাও চিন্তা করলেন— “ ইনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, বিজেতা, সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্বামী এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রাণীদের পিতা, কারণ কি? “আমরা ইহাকে প্রথম উৎপন্ন জীবরূপে দেখেছি, আমরা ইহার পরে উৎপন্ন হয়েছি”। তৎপর ব্রহ্মলোক হতে এক প্রাণী মনুষ্যলোকে চ্যুত হয়ে গৃহবাস পরিত্যাগ করে অনাগারিকত্ব অবলম্বন করেন। এতে তিনি অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

সমাধির দ্বারা তিনি উক্ত পূর্ব নিবাস (ব্রহ্মলোকবাস) স্মরন করেন। কিন্তু কোথায় হতে ঐ ব্রহ্ম বিমানে জন্মান্তর হয়েছিলেন, তা স্মরন করতে তাঁর সমাধির শক্তি ছিল না। তাই তাঁর মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়— ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিবু, বিজেতা, সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্বামী এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রাণীদের পিতা, যাঁর কর্তৃক আমরা সৃষ্টি হয়েছি। তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত অবিপরিণাম ধর্ম, তিনি অনন্তকাল অবস্থান করবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টি আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, বিবর্তনশীল হয়ে এই লোকে আগমন করেছি। এই প্রকারেই তো আপনারা আপনাদের (আচার্য-প্রাচার্য) শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ (সৃষ্টি) রূপে কথিত ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। তিনি (ভগবৎ) বললেন “সৌম্য গৌতম! আপনি যা বললেন, আমরা তাই শুনেছিলাম”। এরূপ বলে ভগবানের কথাকে অভিনন্দন করলেন।

তেবিজ্জ সূত্রে (দীর্ঘ নিকায় ১ম খন্ড শীলস্কন্ধ বর্গ) ও বুদ্ধ ঈশ্বর (সৃষ্টিকর্তা) বিশ্বাসীদের সম্পর্কে এরূপ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন,— এক সময় ব্রাহ্মান বাশিষ্ট ও ভারদ্বাজ ভগবানের নিকট গমন করলেন। তারা উভয়ে ভগবানের সাথে প্রীত্যালাপ ও অভিবাদন জানিয়ে উপবেশন করলেন। অতঃপর বাশিষ্ট বুদ্ধকে বললেন— “হে গৌতম! আমাদের মধ্যে মার্গ-অমার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হচ্ছে, ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি মার্গ, এই মার্গে গমনকারী ব্রাহ্মার (ঈশ্বর) সহিত মিলিত হওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পোক্ষরসাতি ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাহ্মণ, ছন্দাবা ব্রাহ্মণ তাঁরা সকলে এই মত পোষন করে থাকেন— , ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি মার্গ, এই মার্গে গমনকারী

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

ব্রহ্মার (ঈশ্বর) সহিত মিলিত হওয়া যায়” । এ সম্পর্কে ভগবানের মতামত কি? বাশিষ্ট! ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে (ঈশ্বর) প্রত্যক্ষ করেছেন । অথবা তাঁদের আচার্য-প্রাচার্যদের মধ্যে অথবা ঐ সকল ব্রাহ্মণদের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে (ঈশ্বরকে) প্রত্যক্ষ করেছেন । বাশিষ্ট! ব্রাহ্মণদের পূর্বজ ঋষিগণ মন্ত্রের কর্তা, মন্ত্রের প্রবক্তা, যেমন- অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বমিত্র, যমদগ্নি, অংগিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কশ্যপ ভৃগু- তাঁদের মধ্যে কেহ কি আছেন যিনি (ব্রহ্মাকে) ঈশ্বরকে আপন চক্ষুতে দেখেছেন? যাকে জানেন নাই, দেখেন নাই, তাঁর সহিত মিলিত হওয়ার তাঁরা মার্গের উপদেশ করতেছেন । বাশিষ্ট! তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের বাক্য কি অর্থহীন নহে? অবশ্যই গৌতম, এরূপ হলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের বাক্য অর্থহীন । বাশিষ্ট ইহা ইদৃশ হয়েছে, যেমন অন্ধের দল একে অন্যের সঙ্গী হয় অথচ সম্মুখের ব্যক্তিও দেখে না, মধ্যবর্তী জনও না, পশ্চাতের জনও দেখতে পায় না । এজন্য বলা হয় “অন্ধেন নীয়মনো যথা অন্ধাঃ” ।

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বুদ্ধ সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থের নিদান বর্গে বলেছেন-

“অনমতল্লোয়ং ভিক্ষবে সংসারো, পুব্বা কোটি ন
পঞ্ঞায়তি, অবিজ্জা নীবরণং সত্তানং তণহা
সংযোজনানং সন্ধাবতং সংসরতং”

অর্থাৎ- হে ভিক্ষুগণ! এই সংসারের কোন একটা আদি নেই, অন্ত নেই, এমনকি ইহার পূর্ব সীমাও দেখা যায় না। কারণ জীবগণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও সংযোজনের (বন্ধনের) আবরণে আবদ্ধ হয়ে অনন্তকাল সংসারের সন্ধাবন-সংসরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

“এক পুণ্ণগলস্‌স ভিক্ষবে কল্পং সন্ধাবতো সংসরতো সিয়া এবং মহা অট্ঠিকঙ্কলো-অট্ঠিপুঞ্জো-অট্ঠি রাসি যথাথং বৈপুল্লা পব্বতো স চে সংহরতো অস্ম সন্ততঞ্চ ন বিনসেসয়্যং কিস্‌স হেতু?”

অর্থাৎ- হে ভিক্ষুগণ! একজন লোক যদি এক কল্পকাল সংসারে সন্ধাবন-সংসরণ করে, তাহলে তার পুনঃপুনঃ মৃত্যুতে এত সুবৃহৎ অস্থি-কঙ্কাল-অস্থি পুঞ্জ- অস্থি রাশি সঞ্চিত হবে যে, যেমন একটি বৈপুল্য পর্বত। যদি কেহ সংগ্রহ করতে পারে ও সঞ্চিত করতে সমর্থ হয় এবং যদি বিনষ্টও না হয়। অবিদ্যা ও তৃষ্ণা সংযোজনের কারণেই এ পরিণাম ফল হয়।

“এবং দীঘরত্তং খো ভিক্ষবে দুক্খং পচ্চনুভূতং তিব্বং পচ্চনুভূতং, ব্যাসনং পচ্চনুভূতং, কটসি বডিটতং”।

অর্থাৎ- হে ভিক্ষুগণ! তোমরা এতদীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ, তীব্র বেদনা অনুভব করেছ, বিবিধ ব্যাসন দুঃখে ব্যথিত হয়েছে এবং জন্মা-জন্মান্তর নরক যন্ত্রনা বৃদ্ধি করেছ।

“যাবঞ্চিদং ভিক্ষবে অলংমেব সব্বসজ্জাৱেসু নিব্বিন্দিতুং, অলং বিরজ্জিতুং, অলং বিমুচিচতুং..।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

অর্থাৎ- হে ভিক্ষুগণ! এই বিবিধ দুঃখের ভোগের পর তোমাদের একমাত্র উত্তম করণীয় সমস্ত সংস্কার (কর্ম প্রবাহ) বা পঞ্চস্কন্ধের (নাম-রূপ) প্রতি নির্বিন্ণভাবে, বিরাগ (বিতৃষ্ণা) সৃষ্টি করা ও সংস্কার দুঃখ হতে বিমুক্তির উপায় সন্ধান করা ।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে একসময় বুদ্ধ ভিক্ষুদের বলেছিলেন- “তং খো পণাহং ভিক্ষবে নাএওএওস্স সমণস্স বা ব্রাহ্মণস্স বা সুত্তা বদামি, অপিচ যদেব যামং, এণাতং সামং দিট্ঠং, সামং বিদিতং তমেবাহং বদামি” । অর্থাৎ- হে ভিক্ষুগণ! আমি অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের নিকট শুনে বলছি না । যা আমি স্বয়ং জ্ঞাত হয়েছি, স্বয়ং দেখেছি ও স্বয়ং বিশেষভাবে বিদিত হয়েছি, তাই তোমাদের বলতেছি । (দেবদূত সূত্র)

ঈশ্বর বিশ্বাস ইহা একটি মহা ভ্রান্ত দৃষ্টি । পৃথিবী এই একটি কারণে (ঐকিহাসিকতের মতে) ধর্মযুদ্ধে পৃথিবী বহুবার নররক্তে প্লাবিত হয়েছে । ঈশ্বরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল ধর্মযুদ্ধের মূল কারণ । তাই জ্ঞানীগণ বলেন- ধর্মে অন্ধবিশ্বাস পৃথিবীর মানুষের যত অনিষ্ট হয়েছে, এত অনিষ্ট পৃথিবীতে আর কিছু দ্বারা হয় নি বা করতে পারে নি । এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত মনিষী কার্ল মার্কস বিভিন্ন ধর্মের অনিষ্টকারিতা দেখে ধর্মকে মানবজাতির শত্রু ‘অহিফেন’ বলে আখ্যা দিয়েছেন । তিনি কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে সম্পর্কে বলেছেন- ‘ধর্ম’ শব্দে যদি নৈরাশ্র অবস্থার আত্মা, নিষ্প্রাণ জগতের প্রাণ ও জগগণের একটা অব্যক্ত নেশা বুঝায়, তা হলে অবশ্যই বৌদ্ধ ধর্ম ‘ধর্ম’ নহে । তবে যদি ‘ধর্ম’ শব্দে আমরা বুঝি জীবনের পূর্ণতার পথ, আমাদের পার্থিব

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

জীবনের অগণিত দুঃখ তাপ হতে মুক্তির উপায়, তা হলে বৌদ্ধ ধর্ম ‘ধর্ম’ এবং সকল ধর্মের ‘সেরা ধর্ম’। সত্যের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু ‘সত্য’ সত্যানুসন্ধানীদের নাগালেন বাইরে নয়। তাই যুগে যুগে সত্য ধর্মের (সদ্ধর্মের) আবির্ভাবে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস বা ভ্রান্ত দৃষ্টিজাল হতে সত্যসন্ধানী সত্ত্বগণ বিমুক্তিজ্ঞান লাভ করতে পারেন। সিদ্ধার্থ গৌতম ও লক্ষাধিক চারি অসংখ্যে কল্পকাল সত্যের সন্ধানে পারমী, উপপারমী, পরমার্থ পারমী ভেদে সমত্রিংশ পারমী ধর্মতা পালনের মধ্যে দিয়ে ছয় বছর কঠোর তপস্যাশুে গয়ার বোধিদ্রুমমূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ জ্ঞান (অনাবরণ জ্ঞান বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান) লাভ করে ভগবান আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেছিলেন— “আমি পঞ্চস্কন্ধ শরীররূপী গৃহনির্মাতাকে খুজতে গবেষণা করতে করতে সংসারচক্রে আবর্তিত হয়ে ভ্রমনের সময় কত যে দুঃখ পেয়েছি, তা হিসাব করে শেষ করা যাবে না”।

তাই তিনি জন্ম-জন্মান্তর সৃষ্টিকর্তা খুঁজেছিলেন তার মানে তিনি শরীরের স্রষ্টাকে গবেষণা করেছিল। আসলে গৃহ কারক বা সৃষ্টিকর্তা কি আছেন? এর উত্তর তিনি খুঁজছিলেন। এর ফলে তাঁর কত যে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে তার সীমা ছিল না। অবশেষে তিনি ২৫৯৭ বছর পূর্বে গৃহত্যাগ করে ছয় বছর কঠোর তপস্যায় মগ্ন হল— শরীর বা গৃহ নির্মাতাকে গবেষণা করতে। দীর্ঘ ছয় বছর গবেষণায় তিনি পেলেন যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে— “অবিদ্যা-তৃষ্ণা”। কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি কখনও একথাটি বলেননি। যেইমাত্র সত্যের সন্ধান প্রত্যক্ষ নিজস্ব জ্ঞানের দ্বারা তাঁর মধ্যে উৎপন্ন হয়েছে। তখনই উচ্চারণ করেছিলেন— ‘পূর্বে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু’ অর্থাৎ

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

পূর্বে আমার দ্বারা এই যথার্থ সত্য ধর্ম শ্রুত হয় নি, জানতেও পারে নি। কিন্তু এখন ‘চক্ষু উদপাদি, ঞ্জাণং উদপাদি, পঞঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি’ অর্থাৎ এ ধর্মে (সম্যক ধর্মে) চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে এবং আলো উৎপন্ন হয়েছে (ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র)। তদ্ব্যতীত ভগবান বুদ্ধ সত্য সন্ধানী সত্ত্বদের উপলক্ষ করে এ গাথাটি ভাষণ করেছিলেন—

‘যদা চ ঞ্জত্বা সো ধম্মং সচ্চানি অভিসমেসসতি,

তদা অবিজ্জুপসমা উপসন্তো চারিসসতি’। (বিণ্ডুকিমার্গ)

জন্মান্তর যেন রাস্তা চলতে পারে না, ধর্মাস্তর তেমনি নির্বাণগামী রাস্তা ধরতে পারে না। যখন সে আর্যসত্যরূপ (যথার্থ সত্য) ধর্ম জ্ঞাত হয়, তখন সে অবিদ্যা উপশম করে নির্বিকার চিত্তে অবস্থান করে। ‘বৌদ্ধ ধর্মে সৃষ্টিকর্তা’ গ্রন্থের ভূমিকায় অগোছালো এলোমেলা আলোচনা কতটুকু সার্থক এবং পাঠোপযোগী হয়েছে জানি না। এজন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি বিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি। কারণ ত্রিপিটক শাস্ত্র (বুদ্ধবাক্য) চারি প্রকার সাগরের মধ্যে এক প্রকার সাগরের ন্যায়। অন্য তিন হচ্ছে— সংসার সাগর (অবিদ্যা-তৃষ্ণা প্রসূত অনন্ত অনাদি ভবচক্র), জল সাগর (মহাসমুদ্রের জলরাশি) ও জ্ঞান সাগর (সর্বজ্ঞতা জ্ঞান)। সুতরাং সাগর সদৃশ জ্ঞান ভাঙারে আঁওড়াতে আঁওড়াতে শ্রান্ত হয়ে আলোচনা যা করতে পেরেছি তা অতি সামান্যটুকু মাত্র। যেমন— কেহ যদি জল মহাসাগরে সাঁতার দিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে চায়, ক্লান্ত হবে মাত্র বৈকি। সত্য সন্ধানী উপাসক বাবু বোধিমিত্র বড়ুয়া একটি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করে সত্যানুসন্ধানী অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজের বহুলাংশে উপকৃত করবে। এ জাতীয় গ্রন্থ সচরাচর

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

পাওয়া যায় না। ঈশ্বর রাজ্যে নিরীশ্বর প্রকাশ-প্রকাশনা অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ, তবুও লেখক সত্যের আলোচনায় পিছপা হননি। এক্ষেত্রে তিনি দূর্জয় সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ। গ্রন্থের বহুল প্রচার এবং গ্রন্থকারের নীরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি।

প্রবারণ পূর্ণিমা,
১৮-১০-২০১৩ ইং

শ্রী কুশলায়ন থের,
প্রধান পরিচালক,
জ্ঞানসেন বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রামণ প্রশিক্ষণ
ও সাধনা কেন্দ্র।
শৈলেরচেবা. উখিয়া।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

প্রাক আলোচনাঃ

জগত রহস্যময় । জগত ও জগতের জীব সৃষ্টি তথ্য আরো রহস্যময় । কত হাজার বা লক্ষ কোটি বছর আগে এ সৃষ্টি কাণ্ড ঘটেছিল- তা বাস্তবিকই অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে রহস্যই হয়ে আছে । কেননা, কবে, কখন, কিভাবে, কে বা কাদের দ্বারা এ রহস্যময় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও প্রাণী জগতের সূচনা হয়েছিল -তা সঠিকভাবে জানার কোন উপায় নেই । কল্পনার জগতে কোন কোন চিন্তাবিদ বিভিন্ন সীমারেখা উল্লেখ করলেও যুক্তির বিচারে ঠেকেনা । প্রাচীন চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, ধর্মপ্রচারক, ঐতিহাসিক তথ্য অনেক মনীষী জগৎ রহস্য ও সৃষ্টিরহস্য নিয়ে অনেক মতামত প্রকাশ করেছেন এবং বিভিন্ন পুস্তকাদির মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত খাঁড়া করার চেষ্টা করেছেন । বৈজ্ঞানিক গবেষকরাও এ জগৎ রহস্য সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উত্থাপন করেছেন । কিন্তু, কালের পরিক্রমায় কোন তত্ত্ব স্থায়ীত্ব পায়নি । পরবর্তী গবেষকগণ আবার নূতন তত্ত্ব বের করে প্রাচীন সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দিয়েছেন । এভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও বিশ্ব সৃষ্টি রহস্য রহস্যময়ই রয়ে গেছে । হয়তো বিস্ময়ময় পৃথিবী একদিন বিবিধ কারনে উলট-পালট হয়ে যাবে, প্রাণী জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে । তথাপি, সৃষ্টি রহস্যের কূল-কিনারা হবে না । চিন্তাবিদগণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে শুধু কালান্তরের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন । কিন্তু বাস্তবতায় উপনীত হওয়াটা কঠিন হবে । পরিশেষে বলতে হবে জগতের আদি, নেই অন্ত নেই । কালের পরিক্রমায় দার্শনিকগণ, ধর্মীয় প্রবর্তকরা, পণ্ডিতগণ ও

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

বৈজ্ঞানিকগন শুধুমাত্র স্বীয়-স্বীয় মতবাদ ও যুক্তি দিয়ে জগৎ ও জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা দিতে থাকবেন। কূল-কিনারা না পেয়ে Bing-Bang Theory বা ডারউইনের বিবর্তনবাদের মতবাদের মত ভবিষ্যৎ আরো বিবিধ চিন্তাধারনার উপর নির্ভরশীল হবেন। বর্তমানে একুশ শতকে গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিস্ফোরিত হয়ে কিভাবে পৃথিবী নামক গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে তার-ধারণা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। এভাবে কালে কালে নব নব গবেষণার উন্মেষ হবে। নূতন মতবাদ ও উপাত্ত সংগৃহীত হবে। কিন্তু কালের গতি সীমা বা সৃষ্টির গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমার আলোচ্য গ্রন্থে বৌদ্ধাদার্শে সৃষ্টির তত্ত্ব অনুধাবনে বর্তমান বৌদ্ধ দর্শনের উৎপত্তি ও অন্যান্য ধর্ম-দর্শনের উৎপত্তি কাল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রমে মানুষের মধ্যে জগৎ ও সৃষ্টি এবং ধর্মকর্ম নিয়ে চিন্তা চেতনার সূচনা হয়। ক্রমে তা বেদ-বেদান্তে রূপ লাভ করে। এ বেদ-বেদান্তের বাস্তবরূপ লাভ করেছিল আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে। এ বেদ-বেদান্ত তথা বিভিন্ন উপনিষদের পরিণতি কালে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের আবির্ভাব-আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় ছয়শত বছর পরে আসে যীশু খৃষ্টের খ্রিষ্টধর্ম ও দর্শন। যা ঈশ্বর নির্ভর। বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় এক হাজার বছর পর বিশ্বে আর এক নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয় যাকে বলা হয় ইসলাম ধর্ম এবং এ ধর্ম ও দর্শন একত্ববাদে বিশ্বাসী। যা মহান সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ নির্ভরশীল।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

মানুষের জ্ঞান বা চিন্তা চেতনার সূচনাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের উৎপত্তি। এ মধ্যকালের ধর্ম-দর্শনে কিন্তু প্রাচীন বেদ-বেদান্তে ঈশ্বর নির্ভরতা নেই। জগৎ ও জগৎ স্রষ্টা নিয়ে তথা প্রাণী জগতের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। যা কোন অজ্ঞাত শক্তির নিকট নিবেদিত নয়। যাতে আছে কার্যকারণ সম্পর্কিত এক অভিনব বিশ্লেষণ। এ নব বৌদ্ধ চিন্তার কথা হচ্ছে---জগৎ ছিল, প্রাণী জগৎ ছিল, আছে এবং অনন্তকাল ধরে থাকবে। সুতরাং স্রষ্টা, সৃষ্টি ও তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে চিন্তা ভাবনার শেষ হবে না।

প্রাচীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাঃ

আজ থেকে ২৫৫৭ বৎসর পূর্বে জম্মুদ্বীপ তথা ভারতবর্ষ কেমন ছিল এবং বিশ্বের অপরাপর মহাদেশগুলো কেমন ছিল-তা আমরা প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় জানতে পারি। তাতে দেখা যায় জম্মুদ্বীপ বা ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া অন্যান্য মহাদেশ সার্বিক দিক দিয়ে অসংস্কৃত ছিল। তখনকাল রোমান সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতা, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর কথা কাহিনী ও সিন্ধু সভ্যতা তথা আর্যাবর্ত কালের সংস্কৃতি ও ধর্ম দর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সে সমস্ত সভ্যতা কালে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পূজা, দেব-দেবী তথা নানা দৈব শক্তির কাছে মানুষ নতজানু ছিল। বিশ্বের অপরাপর সভ্যতা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের আর্যসংস্কৃতি অনেকটা উন্নত ছিল। ইতিহাস বলে প্রাচীন আর্যরা ধ্যানে-জ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় তথা চিন্তা চেতনায় উন্নত ছিল। প্রাচীন ঋষি মনিষীদের মধ্যে অনেকে

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

অরন্য ধ্যান সাধনান্তে বিবিধ জ্ঞান লাভ করেছিলেন । তাঁরা পরবর্তীকালে বেদের কর্তা নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন । বৌদ্ধ শাস্ত্র মধ্যম নিকায়ে মুখবন্ধে শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার ভণ্ডে লিখেছেন,- “প্রাচীন মুনি ঋষিরা গৌতম বুদ্ধের পূর্বের বুদ্ধ কাশ্যপ বুদ্ধের বাণীর সাথে মিলিয়ে প্রাচীন বেদ-বেদান্তের শ্লোকগুলো বাণীবদ্ধ করেছিলেন ।” প্রাচীন বেদের সংকলকদের মধ্যে অষ্টক, বামদেব, বিশ্বমিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু ছিলেন অন্যতম । অন্যান্য মহাদেশে এ জাতীয় উন্নত চিন্তাধারার কোন ধর্মীয় গ্রন্থ বা দর্শন তত্ত্ব তখন প্রচারিত হয়নি । তাই বলা হয়, আজ থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতা থেকে অনেক উন্নত ছিল । যদিও পরবর্তীকালে যাগ-যজ্ঞ-বলি প্রথা এবং সমাজে বর্ণ প্রথা সৃষ্টি হয়েছিল । সামাজিক বৈষম্য ও জাতি ভেদের প্রাক্কালে ভারতীয় দর্শন ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । তাছাড়া, বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনায় ভারতীয় সমাজ আকর্ষণ নিমজ্জিত ছিল । তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় পুরোহিত প্রথার প্রচলনে এবং তাদের দিক নির্দেশনায় বিপদে-আপদে মানুষ তন্ত্র মন্ত্র তথা স্তোত্র পাঠে, পূজা-পার্বনে, বলিদানে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করত । প্রাচীন বেদ-বেদান্তের সনাতনী বাস্তবধারা থেকে চ্যুত হয়ে সামাজিক বৈষম্য ও জাতি ভেদ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন পূজা পার্বনে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হত । ক্রমে মানুষের মধ্যে একত্ববাদ বা সৃষ্টিকর্তার বা প্রবল শক্তিদ্বারা ঈশ্বরের কল্পনা আসে । জগতের সব সৃষ্টির এবং শক্তির মধ্যে একজন একক মহাশক্তিদ্বারের প্রভাব ক্রমে সমাজে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে । তাই দেব-দেবী থেকে ক্রমে মহাশক্তিদ্বারের আরাধনা-প্রার্থনা-ভজনা শুরু হয় । মানুষ অদৃশ্য

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট নতজানু হয়ে সার্বিক মঙ্গলের জন্য আবেদন-নিবেদন আরম্ভ করে। ফলে পরবর্তীকালের ধর্মপ্রচারকবৃন্দ স্ব-স্ব মতবাদ প্রচারকালে একত্ববাদের ধারণাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। জগতের সব কিছুর উপর একজন আকারবিহীন নিয়ন্ত্রকের কথা বলে স্ব-স্ব ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে ঈশ্বরীয় মতবাদ তথা সৃষ্টিকর্তার প্রভাব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যুক্তিবাদী ও ধর্মশাস্ত্রবিদগণ যুক্তির নিরীখে বলেন, যদি একজন নিয়ন্ত্রক বা স্রষ্টা না থাকেন- তবে কিভাবে জগত ও জীবের সৃষ্টি হয়েছে? সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত এতবড় বিশ্ব, বিচিত্র প্রাণীজগৎ বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ, বাতাস, পানি, অগ্নি তথা বিশ্বও বিস্ময়কর দ্রব্যাদি কিভাবে সৃষ্টি হল? বিভিন্ন উপমা ও যুক্তি সহকারে ঈশ্বরতত্ত্ববিদগণ জগতের সব কিছুর মূল একজন সর্বময় ক্ষমতাধিকারী স্রষ্টার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, মনুষ্য লোক ছাড়া ও যে স্বর্গ নরকের কথা আছে তারও সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন এ মহান ঈশ্বর। তিনি স্বীয় একক, শক্তিবলে দেবলোক, ব্রহ্মালোক তথা সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। এ মতবাদে ভারতীয় দর্শন এক সময় সমাজে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত ও পূর্বে উল্লেখিত বেদ বেদান্তের রচয়িতা ছাড়া ও পরবর্তী কালের উপমহাদেশের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকবৃন্দ এ মহাশক্তিধরের প্রাধান্যতা স্বীকার করে স্ব স্ব মতবাদ প্রচারে বিভিন্ন চিন্তা ধারণার জন্ম দেন। বেদান্তের পরবর্তী কালের চিন্তাবিদদের মধ্যে অজিত কেশকাম্বলী, ককুধ কাত্যায়ন, পূর্ণকাশ্যপ, মঙ্করিন, গোশাল পুত্র, সঞ্জয় বেলটিষ্ঠপুত্র, নিগ্রস্থ নাথপুত্র,

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

নিগ্রস্থ নাথপুত্র প্রমুখ প্রখ্যাত ধর্মদর্শন মতবাদীরা স্ব স্ব মতবাদে বুদ্ধের পূর্ব থেকে ভারতবর্ষে বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন। তৎমধ্যে অজিত কেশকম্বলী, প্রবুধ কাত্যায়ন, পূর্ণকাশ্যপ, কাত্যায়ন গোশাল ছিলেন অব্রক্ষ চর্যাবাসী মতবাদী এবং সঞ্জয় বেলটিষ্ঠপুত্র ছিলেন জ্ঞান ভাববাদী। বৌদ্ধধর্মের প্রখ্যাত দুই দিকপাল শঙ্কেয় সারিপুত্র ও মৌদগলায়ন প্রথম জীবনে সঞ্জয় বেলটিষ্ঠপুত্রের শিষ্য ছিলেন। তাঁর নিকট তারা জ্ঞানবাদ শিক্ষা করে মনের প্রকৃত কামনা পূর্ণ করতে পারেন নি। তাই এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে পরে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের নাগাল পেয়ে মুক্তিপথ লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ছয় তীর্থংকরের মতবাদ ভারতবর্ষে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে ক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই ঈশ্বরের সম্ভ্রুতি বিধানে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা-পূজা ছাড়াও বলিদান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে অজমেধ বলিদান, গোমেধ বলিদান, অশ্বমেধ বলিদান, নরমেধ বলিদান, রাজপেয় যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ নামক বিভিন্ন পন্থা। শ্রষ্টার সম্ভ্রুতি ও দেবতার কৃপা লাভে লক্ষকোটি প্রাণিহত্যার উৎসব ও বিপুল ঝাঁকঝামক সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান হত আবার এমন মতবাদেরও সৃষ্টি হয়েছিল-যে স্বর্গ-নরক সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জীবনকে ভোগের মধ্যে নিবিষ্ট রেখে আনন্দ উৎসবে মত্ত থাকাকে সর্বোত্তম পন্থা বলে ঘোষণা করা হয়। এটা বিখ্যাত চার্বাক দর্শন নামে খ্যাত। এ মতবাদের দার্শনিক মত হল ‘ঋনং কৃত্ব্যা, ঘ্রতং পিবেৎ যাবুজীবৎ সুখং তৃষ্টেয়েৎ’ অর্থাৎ ঋণ করে হলেও ঘি খেয়ে জীবনকে সুখে রাখাই উত্তম কর্ম। এ সময় নিগ্রস্থনাথ মতবাদেরও যথেষ্ট

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ দর্শনে স্বর্গ-নরকের কথা থাকলেও ঈশ্বরীয় চিন্তাধারায় তেমন প্রভাব ছিল না। তবে কঠোর সাধনায় মুক্তি লাভের কথা আছে। পার্শ্বনাথের এ চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ থেকে ধ্যাণ সাধনার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, মহাবীরের জৈনধর্ম তৎকালে ভারতবর্ষে বিশেষ স্থান দখল করেছিল। তিনি ঈশ্বরবিহীন কর্মবাদী ছিলেন। এভাবে বিভিন্ন মতবাদে ও মতাদর্শে ভারতবর্ষ যখন হাবুডুবুতে ছিল তখন আজ থেকে ২৫৫৭ বৎসর পূর্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হয়েছিল। তিনি গৃহ ত্যাগে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনে সাধনান্তে বিশ্বে একটি নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বোধি বা প্রজ্ঞা লাভে প্রতিষ্ঠা করেন বৌদ্ধমত বা বৌদ্ধদর্শন। যা অপরাপর সকল মতবাদের বিপরীতে সম্পূর্ণ এক নতুন মতবাদ। প্রাচীন ভারতীয় বেদান্তবাদের ঈশ্বরমুখী দর্শনের বৈপরীত্যমূলক মতবাদ হচ্ছে- বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন। বুদ্ধ অভিনব আকারে যে ধর্ম-দর্শন প্রচার করেছেন- তা আজ অবধি এক বিস্ময়কর মতবাদ। কেননা, ঈশ্বরবিমুখীতা বা কারও উপর নির্ভরশীল না হয়ে সম্পূর্ণ স্বকর্মের মধ্যে তিনি মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। এখানে কোন কর্তা বা ভাগ্যবিধাতার বালাই নেই। কারও কৃপা বা দয়ায় কোন কিছু লাভ বা মুক্তির পাওয়ার বিধান বুদ্ধ দেন নি। তাই বৌদ্ধদর্শন ও মতবাদ বিশ্বের গবেষকদের নিকট এক চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর দর্শন। তাই বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে জ্ঞানীরা যতই ঘাটাঘাটি করেন-ততই বিমোহিত ও স্তম্ভিত হন। কেন বিমোহিত ও স্তম্ভিত হন-তা পর্যালোচনা করাই প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ। কোন স্রষ্টা বা শক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে বুদ্ধ কি দিয়েছেন, কি প্রকাশ করেছেন তা আলোচনা করাই আমার লেখনীর মূখ্য উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

গৌতমবুদ্ধের পূর্বে প্রচলিত বেদের মূল শ্লোকগুলো কাশ্যপ বুদ্ধের বাণী বলে গৌতম বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন মুনিঋষিরা ক্রমে কঠিন রেখে তা পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। তাই বৌদ্ধমতের সাথে প্রাচীন বেদের প্রচুর মিল পরিলক্ষিত হয়। তাই গৌতম বুদ্ধ অন্যান্য মতবাদ নিয়ে সমালোচনা করলেও বেদের প্রাচীন সংস্করণ নিয়ে কোন কথা বলেন নি। (মধ্যম নিকায় ২য় ভাগ, ভূমিকা পৃ:(২১)৪৩)। প্রাচীন পুরানে বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুরানিকরা লিখেছেন -

“নমো বেদ রহস্যায়নমস্তে বেদ যোনয়ে,
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় নমস্তে জ্ঞানরূপিনে।”

কিন্তু সেই প্রাচীন বেদ-বেদান্ত পরবর্তীকালে সংস্কৃত হয়ে নব্যরূপ ধারণ করে ঈশ্বর বা স্রষ্টার কর্তৃত্ব নিয়ে ঈশ্বরমুখী হয় এবং তাতে বিবিধ যাগ-যজ্ঞ তথা বলিপ্রথাও সামাজিক শ্রেণিভেদ সৃষ্টি করে। তাতেই বৌদ্ধ দর্শনের সাথে প্রাচীন তথা তৎপরবর্তী ধর্ম-দর্শনের পার্থক্য। বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ এক অভিনবত্ব নিয়ে মানুষকে জাগতিক দুঃখ মোচনের পথ দেখিয়েছেন। তাই মনিষীদের মতে বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে “The flower of Indian Philosophy”]

বৌদ্ধ দর্শন ও অন্যান্য দর্শনের পার্থক্য :

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পূর্বে পৃথিবীর কোথাও কোন সম্যক দর্শন পরিলক্ষিত হয় না। আজ হতে পাঁচ হাজার বৎসরাধিক পূর্বে ভারতবর্ষে যে চিন্তা-চেতনা বা আর্যাবর্তকালের সূচনা হয়েছিল-তা বিশ্বের কোথাও দেখা যায় নি। যদিও বিভিন্ন সভ্যতার কথা জানা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের বিপ্লবের ফলে এক

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

সময় ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গায় বৌদ্ধ দর্শনের অনুসারীরা সদ্ধর্ম চর্চা করতেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশতবছর পরে খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব হয়। এ ধর্ম দর্শনের মুখ্য বিষয় এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার কথা এবং এ ধর্মের প্রবর্তকের সহায়তায় সব পাপকর্ম সৃষ্টিকর্তার ক্ষমা করা। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা সব অকুশলকর্ম - তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা বলে ক্ষমা করবেন। আর সুপারিশ করার মাধ্যম হচ্ছেন প্রভু যীশু। এ একত্ববাদে মানুষ সহজে বিশ্বাসী হয় এবং দ্রুত খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। এ ধর্ম দর্শনের মুখ্য বিষয় বা লক্ষ্য হচ্ছে স্বর্গ লাভ। যাতে সুখ আর সুখ। খ্রীষ্টধর্মের আরো পাঁচশত বৎসর আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় এক হাজার বছর পরে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয়। ইসলাম ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বেহেশত বা স্বর্গ লাভ করা। এ ধর্ম ও দর্শনের মুখ্য বিষয় খ্রীষ্টধর্মের মত একত্ববাদ বা এক স্রষ্টায় বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মের আল্লাহ বা মহাশক্তিধর স্রষ্টা সব কিছুর মালিক। তাই এই স্রষ্টাই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। তিনি মানুষের পাপ মোচন করেন। তবে এ ধর্মের লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে কোন সত্ত্বার মৃত্যুর পর জন্মান্তর হয় না। হাশরের দিন বিচারের পর স্বর্গ বা নরকে পাঠানো হবে। এ কাজ স্রষ্টাই করবেন। স্রষ্টা বা সর্বক্ষমতাদিকারী দিক দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের মিল থাকলেও জন্মান্তর নিয়ে মিল নেই। আর বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের সাথে উভয় ধর্মের স্রষ্টা নিয়ে কোন মিল নেই। প্রাচীন ভারতীয় অধিকাংশ দর্শন পরবর্তীকালের খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম দর্শনের সাথে সৃষ্টিকর্তা ও জন্মান্তর নিয়ে কোন মিল নেই। যদিও খ্রীষ্টধর্মে জন্মান্তর আছে তা বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদের মত নহে। তাই বলা যায়, প্রাচীন বৌদ্ধ পূর্বযুগ এবং পরবর্তীকালে প্রচারিত ধর্মসমূহের মৌলিক আদর্শের সাথেও বৌদ্ধদর্শনের

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

বিশাল পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে কোন একক সৃষ্টিকর্তা বা প্রবল ক্ষমতাধারীর কল্পনা নেই। তাই বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের অভিনব ধর্ম-দর্শন এবং বৌদ্ধ পর্যবেক্ষনে বিমোহিত হতে হয়। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হচ্ছে স্বকৃত কর্মফল নিজকে ভোগ করতে হয়। কোন ক্ষমতাধর বা শক্তিধর পাপ ক্ষমা করতে পারেন না। নিজের পূর্বকৃত সুকর্ম এবং বর্তমানের কুশলকর্মের প্রভাবে ব্যক্তি যে পুণ্য সঞ্চয় করেন তা-দিয়ে স্বর্গ-ব্রহ্মলোক লাভ করেন, বৌদ্ধদের মূল লক্ষ্য নির্বাণ। বিশ্বের অধিকাংশ প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের মূল প্রতিপাদ্য বিয়য় হচ্ছে মহাশক্তিধর শ্রষ্টার নিয়ন্ত্রনে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে এবং এ ধর্মসমূহের মূল লক্ষ্য স্বর্গ বা বেহেশত লাভ। তবে প্রাচীন সনাতনী চিন্তাধারার সাথে ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন মুনি-ঋষিরা সাধনান্তে স্বর্গের পরে ব্রহ্মের কথা বলেছেন। তবে ব্রহ্মাকে ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্তা রূপেও কল্পনা করা হয়েছে। আবার সনাতনী চিন্তাধারায় কেউ কেউ বৌদ্ধ নির্বাণে বিলীন হবার মতো সাধক সাধনাবলে ব্রহ্মে লয় হতে পারেন বলে অভিমত দিয়েছেন। বুদ্ধ এ ব্রহ্মলোকের কথা ঋষি আলাড়-কালামের কাছে ধ্যানশিক্ষাকালে অবগত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সত্ত্বার চির নিবৃত্তি হয় না। তাই তিনি তাঁকে ছেড়ে বোধিজ্ঞান অর্জনে তৎপর হয়েছিলেন।

জগৎ ও পরলোক সম্পর্কে বুদ্ধকে বিভিন্ন জনের প্রশ্নঃ

বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, সৃষ্টি, শ্রষ্টা এবং বিশ্বজগৎ নিয়ে আলোচনাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধকে অনেক পরিব্রাজক ও পণ্ডিত তিন্তু সঙ্ঘ জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

প্রশ্ন করেছিলেন । ক্রমে সেই প্রশ্নাবলী এবং ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের প্রদত্ত উত্তর পর্যালোচনা করা হল । বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র ত্রিপিটক । এ ত্রিপিটকের বিভাগের নাম সূত্র পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক । তন্মধ্যে সূত্র পিটকে বুদ্ধের প্রধান দেশনা বা বস্তুব্য সমূহ বিধৃত রয়েছে । সূত্র পিটকের পাঁচটি গ্রন্থ । গ্রন্থগুলো হল মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, দীর্ঘ নিকায় এবং খুদ্দক পাঠ । মধ্যম নিকায়ে “মালুংক্য পুত্র” সূত্র নামক একটি সূত্র আছে । এ নিকায়ে ৭৪ পৃষ্ঠায় মালুংক্যপুত্র নামে এক ভিক্ষু বুদ্ধকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করেছিলেন । প্রশ্নগুলো হচ্ছে -

- ১ । লোক শাস্ত্বত কি না?
- ২ । লোক অশাস্ত্বত কি না?
- ৩ । লোক অন্তবান কি না?
- ৪ । লোক অনন্তবান কি না?
- ৫ । যেই জীব সেই শরীর কি না?
- ৬ । জীব অন্য শরীর অন্য কি না?
- ৭ । মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন কি না?
- ৮ । মৃত্যুর পর তথাগত না থাকেন কি না?
- ৯ । মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না ও থাকেন কি না?
- ১০ । মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন ও না-না থাকেনও না?

এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিব্রাজক ও ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধকে লোক ও লোকরহস্য নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন । প্রশ্নোত্তরে কেউ খুশী হয়েছিলেন বা কেউ খুশী হতে পারেন নি । কিন্তু বুদ্ধ যা বাস্তব সত্য তাই প্রকাশ করেছিলেন । প্রথম প্রশ্ন লোক সর্ষ্পকীয় । লোক বলতে মনুষ্যলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদিকে বুঝায় । আর ত্রিভুবন বলতে লোকজগৎ, রূপ ব্রহ্ম

ও অরূপ ব্রহ্মকে বুঝায়। এ সমস্ত বিষয়গুলো শাস্ত্র বা স্থায়ী কি না এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের মতে অস্থায়ী কি না জিজ্ঞাসিত করা হয়েছিল। উত্তরে বুদ্ধ কি বলেছিলেন তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এ লোক সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছিলেন, “ভিক্ষুগণ! লোক সম্বন্ধে চিন্তা করো না। কখন কিভাবে লোক সৃষ্টি হয়েছিল এবং কতদিন বা সময় লোকালয় গুলো থাকবে তা চিন্তা করে মীমাংসা করা যায় না। ইহা চেতনার অতীত। তাই লোকচিন্তা বাদ দিয়ে, দুঃখমুক্তির পথ খোজাঁই উত্তম মঙ্গল। বুদ্ধ কেন এ কথা বলেছিলেন, তা একটু বিচার-বিবেচনা করলেই বুঝা যায়। কেননা, লোক বা জগতের আদি অন্তের খোঁজ পাওয়া যায় না। কোন কোন ধর্মে অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে- অমুক সময়ে বা অমুক কালে লোকালয় সৃষ্টি হয়েছে। আবার অমুক সময়ে এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। যা সম্পূর্ণ একটা কল্পনা ভিত্তিক বা অনুমান নির্ভর মাপকাঠি দেয়া হয়েছে। যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কেননা, যে অমুক সময়ের কথা বলা হয়েছে - সে সময় তো আমরা কেহ থাকব না বা অতীত বা বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের হাজার লক্ষ কোটি বৎসরেও কেউ দেখবে না বা থাকবে না। সুতরাং, একটা কল্পনার উপর বলা হয়েছে যে, অমুক সময়ের প্লাবনে এ বিশ্ব ধ্বংস হবে এবং নতুন বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি হবে। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বৈজ্ঞানিক ভাবে যোগ-বিয়োগ তথা বিবিধ অংক কষেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। বলেছেন আজ থেকে এত হাজার কোটি বছর পূর্বে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর বয়স এত হাজার কোটি বছর। অপর বৈজ্ঞানিকগণ নূতন ফসিল বা প্রাচীনকালের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বলেন, না, এত কোটি বছর আগে বিশ্ব

সৃষ্টি হয় নি। আরো পূর্বে বা পরে সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং আদি অন্তের সঠিক সীমারেখায় পৌছা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। এজন্য বুদ্ধ বলেছিলেন, “ভিক্ষুগণ! লোকচিন্তা করিও না, ইহার আদি বা অন্ত নেই। এর কোন সমাধা নেই। শুধুমাত্র সময়ের অপব্যয় হবে মাত্র।” তাই লোকচিন্তা সম্পর্কে বুদ্ধ পরিস্কার করে অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্ক নিপাতে বলেছিলেন -

“লোক চিন্তা ভিক্ষবে অচিন্তেয্যা, ন চিন্তেতব্ব, যং চিন্তেতো উম্মাদস্স বিঘাতস্স ভাগী অস্স।”

অর্থাৎ লোক শাস্বত বা অশাস্বত কিনা তা ভাবার প্রয়োজন নেই। ভাবতে ভাবতে, চিন্তা করতে করতে তথা গবেষণা করতে করতে জীবন চলে যাবে, উম্মাদ বা বিকারগ্রস্ত হতে হবে তবুও আদি ঠিকানা বা শেষ ঠিকানা পাওয়া যাবে না। তাই ইহা অচিন্তনীয়। তা না ভেবে জীবনের দুঃখ উপশমের পথ অন্বেষনই প্রকৃত চিন্তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ জাতীয় প্রশ্নসমূহ বুদ্ধের দর্শনে অব্যাকৃত বা অবাস্তুর বলা হয়েছে।

জগৎ চিন্তা বা জগৎ স্রষ্টার চিন্তাতে প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব বিদগণ, দার্শনিকগণ এবং বৈজ্ঞানিকগণও প্রচুর আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। সেই প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। শুধুমাত্র ঐকিক নিয়ম বা বীজগনিতীয় সূত্রের মত ‘ক’ ধরে X বা Y ধরে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আদি অন্তের ঠিকানায় পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তাই বুদ্ধ অচিন্তনীয় বিষয় চিন্তা না করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ জাতীয় অন্যান্য প্রশ্নসমূহ অকথনীয় বা অব্যাকৃত। তাই মালুংক্য পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে এবং বিভিন্ন পরিব্রাজকের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন দশ অব্যাকৃত প্রশ্ন অর্থসংহিত নহে,

ব্রহ্মচর্যের উপকারী নহে। তাই তা চিন্তা না করে উপকারের উপায় পথে হাটা উচিত। বুদ্ধ উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, শকটে উঠে রাস্তা দিয়ে যাবার মাঝপথে শকট দুর্ঘটনায় পতিত হলে আগে আহত ব্যক্তির পরিচর্যা করতে হবে, আহত ব্যক্তিকে আগে হাসপাতালে নিতে হবে। কে গাড়ী বানিয়েছে, কার গাড়ী, চাকা কোথাকার, কি কি দিয়ে গাড়ী তৈরী হয়েছে' ইত্যাদি খুঁজতে থাকলে আহত ব্যক্তি মারা যাবে। আগে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করতে হবে। তদ্রূপ লোক চিন্তা বা সৃষ্টিকর্তার আদি অন্ত খুঁজতে গিয়ে জীবন প্রদীপ নিভে যাবে-আদি অন্তে পৌঁছানো যাবে না। তাই বুদ্ধ বলেছেন, অচিন্তেয়্যা, ন চিন্তেতব্বা। ইহা অচিন্ত্যনীয়, চিন্তা করিওনা।

পরিব্রাজক বচ্চগোত্ত বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন, “যাঁরা বিমুক্তি লাভ করে বা অরহত্ত্ব লাভী তাঁরা মৃত্যুর পর কোথায় অবস্থান করেন?” এ প্রশ্নও অকথনীয় বিষয়। যা সম্পূর্ণ নির্বাণ উপদ্ধির মত অনুভবের বিষয়। তবুও বুদ্ধ বচ্চগোত্তকে উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, “যে প্রদীপের অগ্নি শিখা নিভে যায়, তা কোন দিকে গেছে দেখা যায় কি? বচ্চগোত্ত বলেছিলেন, “না, দেখা যায় না, তেমনি বিমুক্তি লাভী ব্যক্তি কোন দিকে গেছেন দেখা যায় না, বলা যায় না। বলা যায় নিভে গেছে, জীবন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। ইহা সম্পূর্ণ অনুভব বা উপলদ্ধির বিষয়। বৌদ্ধ ধর্মের এ ‘নির্বাণ’ চিন্তাই বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম, থেকে বৌদ্ধ দর্শনকে আলাদা করেছে। তাই বৈজ্ঞানিক তথা চিন্তাবিদগণ বৌদ্ধ ধর্মকে ধর্ম না বলে একটি দর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন। Einstein বলেছিলেন, Buddhism is not a religion, but a philosophy’

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

কেন এ মন্তব্য তা বিবেচনার বিষয়। আমরা জানি, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন গতানুগতিক ঐশ্বরীয় চিন্তা ধারার বিশ্বাসী নহে। এখানে ঈশ্বর বা স্রষ্টার দাপঠ নেই। যুক্তির নিরিখে সম্পূর্ণ স্বকীয় কৃতকর্মের ফলাফলের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ত্ব নিহিত।

মৃত্যুর সময় যে দেহ বা প্রাণ বায়ু নিয়ে একজন লোকের বা যে কোন সত্ত্বার মৃত্যু হয়-মৃত্যুর পর সেই জীব বা শরীর থাকে কিনা তাও অকথনীয় বা অব্যাকৃত বিষয়। কেননা, বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। জীবনের এ রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি' দেখানো হয়েছে। জন্মান্তরটা হচ্ছে কার্যকারণ নীতির প্রক্রিয়ার ফসল। যা'তে নাম রূপের সৃষ্টি হয়ে ক্রমে সত্ত্বার জীবন প্রবাহ চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হয়। কিছু যেতে দেখা যায় না অথচ নামরূপ গ্রহণ করে বা জীবন ক্রিয়া চলে। এ বিষয়টা ছাত্রকে গুরুর শিক্ষাদানের মত। যেমন একজন মহান 'ভিক্ষু তার শিক্ষা নবীশ শ্রামণকে সূত্রপাঠ মুখে মুখে বলে মুখস্ত করালেন। শিষ্য পরে সে মন্ত্র মুখস্ত বলেন। এখানে গুরু শিষ্যকে কি দিলেন তা দেখা যায় না। অথচ ছাত্র পেয়েছেন ইহা সত্য। তেমনি এক মোমবাতি থেকে আর এক মোমবাতি প্রজ্জ্বলতি করলে উভয়টা জ্বলবে। প্রথমটার আলোর কোন কর্ম বেশী পরিলক্ষিত হয়না অথচ অন্যটা ও জ্বলছে। তেমনি বিজ্ঞান সন্ততিত্বেই জীবের জীবন প্রক্রিয়া চলছে। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য মালুংক্যপুত্র ও পরিব্রাজক বচ্চগোত্তের প্রশ্নের আলোকে জগৎ ও জীব সম্পর্কীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জীবন ও জগৎ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে বৌদ্ধমতের আরো আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে প্রশ্নের উদ্বেক হয় :

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে প্রশ্নের উদ্বেক হয় এ অধ্যায়ে অপরাপর ধর্ম দর্শনের সাথে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মৌলিক পার্থক্য সমূহ পরিলক্ষিত হবে। ঈশ্বর বা ভগবান কে এবং বুদ্ধকে কেন ভগবান বলা হয় তা ক্রমে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দেখব ঈশ্বর বা মহাশক্তির বা স্রষ্টা কে এবং তিনি স্বয়ং সৃষ্ট কি না কিংবা কোন উপাদানে তিনিএত শক্তিশালী। চিন্তাশীল মানুষ ও গবেষকদের মনে যে প্রশ্নের উদ্বেক হয় :

- ১। ঈশ্বর বা স্রষ্টা কে?
- ২। তিনি কিভাবে সৃষ্টি হলেন?
- ৩। তিনি কি স্বয়ং সৃষ্ট?
- ৪। তিনি স্বয়ং কোন কোন উপাদানে সৃষ্ট?
- ৫। এত উপাদান তিনি পেলেন কোথায়?
- ৬। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আগে না স্রষ্টা আগে?
- ৭। জগৎ আগে থাকলে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করলেন কিভাবে?
- ৮। তিনি কোথায় অবস্থান করে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন?
- ৯। জগৎ আগে থাকলে স্রষ্টার সৃষ্টি কথা কি ঠিক?
- ১০। সৃষ্টিকর্তার ও কি কোন স্রষ্টা আছে?
- ১১। যদি তিনি শূণ্য বা আকার হীনহন তবে সাকার কিভাবে সৃষ্টি করলেন?
- ১২। শূণ্য কে ০ (শূণ্য) দিয়ে গুণ করলে কি হয়?
- ১৩। স্রষ্টা কি সব ধর্মের স্রষ্টা?

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

- ১৪ । তিনি যদি সকলের সৃষ্টিকর্তা হন-তবে এত ধর্মের
শ্রষ্টা কেন?
- ১৫ । ধর্মনিয়ে তথা বিভিন্ন মতবাদে মানুষে মানুষে
মারামারি হানাহানি তিনি কি দেখেন না?
- ১৬ । পিতা সকল সন্তানকে সমান চোখে না দেখে মানুষকে
এত ভেদাভেদ করে সৃষ্টি করলেন কেন?
- ১৭ । পৃথিবীর মানুষের ধরন, গঠন ও রং এ এত পার্থক্য
কেন?
- ১৮ । কেন ধনী দরিদ্রের এত বৈষম্য?
- ১৯ । আফ্রিকা কি শ্রষ্টার সৃষ্ট এলাকার বাইরে? না হয়
সেখানে এত ক্ষুৎপিড়িতের হাহাকার কেন?
- ২০ । সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির তিনি শ্রষ্টা হলে সেখানে তাঁর
নিয়ন্ত্রণ নেই কেন?
- ২১ । কেন ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ
লক্ষ প্রাণী ও সম্পদের ক্ষতি হয়?
- ২২ । লেং, খোড়া, আতুর, অন্ধ, বধির তথা বিকালঙ্গ
প্রাণীর ও কি তিনি শ্রষ্টা?
- ২৩ । কেন এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে ধরে খায়?
- ২৪ । সব প্রাণী বাচঁতে চায় তা'কি তিনি দেখেন না?
- ২৫ । তিনি কেন তাঁকে পূজার জন্য বা মনতুষ্টির জন্য প্রাণী
হত্যার বিধান দিয়েছেন?
- ২৬ । যার সন্তান সে কি খায়?
- ২৭ । শ্রষ্টার ধর্ম পালনকারী কখন স্বর্গে বা বেহেশতে
যাবে? কেউ মৃত্যুর পর পর বা কেউ হাশরের কথা বলে
কেন?

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

- ২৮। স্বর্গ লোক ও যোজক প্রত্যেক ধর্মপালনকারীর জন্য
কি আলাদা করে সৃষ্টি করা হয়েছে?
- ২৯। যদি আলাদা না হয় তবে কোন কোন ধর্মের
অনুসারীগণকে মৃত্যুর পর স্বর্গে নেবেন?
- ৩০। ঈশ্বর দয়ালু হলে এত শ্রেণীভেদ, এত বৈষম্য, এত
সমাজ ব্যবস্থা কেন?
- ৩১। তিনি কি মহাশক্তিশালী নন? যদি হন তবে দুষ্টকে
সরাসরি দমন করেন না কেন?
- ৩২। তিনি কি বর্তমানে তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় নেই? থাকলে
সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ নেই কেন?
- ৩৩। স্রষ্টার অবয়ব বা আকার কেমন?
- ৩৪। তিনি মহাশক্তিধর হলে সকলের মানসিকক্রিয়া
এরকম করতে পারেন না কেন?
- ৩৫। যোজক বা নরকে তাঁর সৃষ্টি জীব কষ্ট পেলে তিনি
দুঃখ পাননা কেন?
- ৩৬। মানুষের রোগ ব্যাধির ও কি তিনি স্রষ্টা?
- ৩৭। কোন কোন এলেকায় খাদ্যের অভাব কেন?
- ৩৮। তিনি প্রাণীকে অমরত্ব করে সৃষ্টি করলেন না কেন?
- ৩৯। মহাশক্তি ধরের অমরত্ব করার কি ক্ষমতা নেই?
- ৪০। মহাশক্তিধর স্রষ্টা ও কি মরণশীল?
- ৪১। দেবতা বা জীনের কি তিনি স্রষ্টা?
- ৪২। খারাপ জিন তিনি কেন সৃষ্টি করবেন?
- ৪৩। মহাশক্তি বলে তিনি মানুষের পশুত্ব কেন দূরীভূত
করেন না?
- ৪৪। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার কেন? ইহা কি তিনি
দেখেন না?

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

- ৪৫ । জগৎ বা প্রাণী সৃষ্টির কি নির্দিষ্ট সময় আছে?
- ৪৬ । জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় । এ অনিত্য ও দুঃখেরও সৃষ্টিকর্তা তিনি?
- ৪৭ । টর্ণেডো, সিডর, আইল্যাক, লাইলা, মহাসেন ইত্যাদির কি তিনি সৃষ্টিকর্তা?
- ৪৮ । স্রষ্টার কি আদি অন্ত নেই?
- ৪৯ । তিনি কি অবিরাম সৃষ্টির মধ্যে আছেন? না বিশ্রামে?
- ৫০ । তিনি মহাশক্তিধর হলে দুর্ঘটনায় সময় রক্ষা করেন না কেন?
- ৫১ । আসলে কথিত স্রষ্টার কোন আধিপত্য কি জগতে নেই? .

এমম্বিধ বহু প্রশ্ন জাগে স্রষ্টা সম্পর্কে । বিশেষ করে চিন্তাবিদগণ জগৎ ও প্রাণীর সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে কান্ড হয়ে পড়েন । কিন্তু, কোন বাস্তব সত্যে উপনীত হতে পারেন না । উপরে ঘুটিয়ে ঘুটিয়ে ৫১টি প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে । যেগুলোর সমাধা নেই । বিশেষ করে যে মহান স্রষ্টা বা শক্তি ধরের কল্পনা করা হয়- তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে । কেননা, স্রষ্টার ও তো একজন সৃষ্টিকর্তার দরকার । আর স্রষ্টা যদি এমনি সৃষ্টি হন-তা' হলে আমরা কেন এমনি এমনি সৃষ্টি হতে পারবনা? কেননা, স্রষ্টার সৃষ্টির পিছনে তো কিছু উপাদান থাকার কথা । ঐ সমস্ত উপাদান গুলো থাকলে প্রাণী জগৎ ও এমনি এমনি সৃষ্টি হতে পারে । সুতরাং, স্রষ্টার চিন্তা নিরর্থক ।

জগত আগে না ঈশ্বর আগে :

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা যদি থাকে- তাঁকে আমরা বাস্তবে পাইনা কেন? উপরে উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর মিলেনা কেন? সোজা কথা ঈশ্বর বা ভগবান নামে কোন শ্রুতি থাকলে তিনি কিভাবে সৃষ্টি হলেন প্রশ্ন এসে যায়। এ প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বাদীরা নীরব থাকেন। এ প্রশ্নের উত্তর খোজাঁ নিষেধ। কেননা, শ্রুতির উপর কি কথা বলা যায়? সেজন্য অনিসন্ধিৎসু মনের খোঁরাক জুটেনা, প্রশ্নই থেকে যায়- উত্তর মেলা ভার। ঈশ্বরবাদীরা বলেন, তিনি স্বয়ং সৃষ্ট। প্রশ্নবাদীরা বলে তিনি স্বয়ং সৃষ্ট হলে আমরা স্বয়ং সৃষ্টি হতে পারি না কেন? ঈশ্বর যেমন স্বয়ং সৃষ্ট, তেমনি প্রাণীরা স্বয়ং সৃষ্ট হতে পারে। ঈশ্বর আগে সৃষ্ট না জগত আগে সৃষ্ট? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। কেননা, জগত আগে থাকলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এ কথা মিথ্যা হয়ে যায়। সুতরাং, সব মিলিয়ে অগোছালো ও এলো মেলা অবস্থা। উপরে যে সমস্ত প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে, সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নেই। কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে এ সমস্ত প্রশ্ন না, করার জন্য বলা হয়েছে। তার কারণ, তাতে বাড়াবাড়ি হবে এবং ধর্মশাস্ত্রের অবমাননা হবে। তাই, চুপচাপ থাকা ভাল। কিন্তু যুক্তিবাদীরা যুক্তির নিরিখে এবং বৈজ্ঞানিকেরা চুল চেরা বিশ্লেষণে শ্রুতির ব্যাপারে সন্দেহান। কেননা, যুক্তির ব্যাকরণে শ্রুতির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সূত্র পাওয়া যায় না। আর বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ কোন প্রমাণ মিলেনা। তাই শ্রুতির ধারণা চিন্তাবিদদের কাছে গৌণ।

কোন সময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল বা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন তার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা চাই। এ রকম

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

কোন সাদি. বা নির্দিষ্ট সীমা পাওয়া যায় না। আর নির্দিষ্ট সীমারেখা ধরলে আবার প্রশ্নহয়-এর পূর্বে কি অবস্থা ছিল? এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্থাপিত হয়ে কোন সমাধা আসেনা। বৈদিক মতে ব্রহ্মাই বিশ্বজগতের মূল। কিন্তু রাজকুমার সিদ্ধার্থ ব্রহ্ম সম্পর্কে মুনি অসিত দেবল, মহাঋষি আলাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের নিকট জেনেছেন। তিনি তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞানে বিমোক্ষের পথ পাননি। এ ব্রহ্মাকে বৈদিক গণ সব সৃষ্টির মূল বললে ও যুক্তির বিচারে ঠিকেনা। কেননা, এ ব্রহ্মার পতন আছে। কালক্রমে ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মলোক ত্যাগে অন্যত্র জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ঋষি উদ্দালক বলেছিলেন, “সৎ অগ্রে ছিল এক ও অদ্বিতীয়। এ সৎ হচ্ছেন স্রষ্টা। তাঁর ইচ্ছাতে ক্রমে তেজধাতু, তেজধাতু হতে আপধাতু এবং আপধাতু ক্রমে বায়ু ও পৃথিবী গঠিত হয়েছে।” এরপর অভজ, জীবজ ও উদ্ভিজ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। এভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মনীষীগণ প্রাণীজগৎ ও বিশ্ব নিয়ে কত ভাবনাই না করেছেন। কিন্তু, কল্পনা প্রসূত একটা ধারণা করা ছাড়া বাস্তব কোন সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া মোঠেই সম্ভব হয়নি।

বৌদ্ধমতে সৃষ্টিকর্তা - অবিদ্যা ও তৃষ্ণা :

এখন বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি সম্পর্কে যে ধারণা দেয়া হয়েছে -তা আলোচনা করা হচ্ছে। আগেই বলেছি বৌদ্ধধর্ম আজ থেকে ২৫৫৭ বৎসর পূর্বে প্রচারিত হয়। এ সময় ভারতবর্ষ ছাড়া বিশ্বের কোথাও কোন সংস্কৃত ধর্ম ছিলনা। ভারতে বেদবেদান্তের প্রভাব এবং বিভিন্ন মুনিঋষিগণের মতবাদ ছিল। এ রকম ছয় জন, তীর্থংকরের নাম এবং

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

মুনিঋষিদের নাম পূর্বে উল্লেখিত করা হয়েছে। বুদ্ধের ধর্ম প্রচার কালে ও বিভিন্ন ধর্মীয়, মতাদর্শ ভারতবর্ষে, ভরপুর ছিল। তবে সেই মতাদর্শে দুঃখের চিরনিবৃত্তির ব্যবস্থা ছিলনা। তা লক্ষ্য করে বুদ্ধ মধ্যম নিকায়ে 'অরিয়পরিয়সেন' সূত্রে বলেছেন, “পাতুর হোসি মগধেসু পূবের ধম্মো অসুদ্ধো সমলেহি চিস্তিতো।” অর্থাৎ মগধে পূর্বের বহু অশুদ্ধ ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে। যা' মানবের মুক্তির পথ দেখায় না। তাই সেই ধর্মমত সমূহ শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ নহে। বুদ্ধ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অনর্থক চিন্তা না করার কথা বলেছেন। তিনি শ্রুটা নিয়ে বেশী, ঘাটাঘাটি না করে মুক্তির পথে হাটার কথা বলেছেন। কারণ, সৃষ্টিকর্তার চিন্তার শেষ নেই। কোন সমাধানে পৌঁছা যায় না। সে জাতীয় কিছু বিষয়ে বুদ্ধ অনর্থক বিতর্ক করে সময় ক্ষেপন না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। বুদ্ধ মালুংক্যপুত্রকে এবং বচ্চগোস্তুকে এ জাতীয় প্রশ্নের পক্ষে কোন যুক্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন। বুদ্ধ এ জাতীয় প্রশ্নকে অবাস্তব, অব্যাকৃত বা অনর্থক বলে এড়িয়ে গেছেন। কেননা, এ প্রশ্নের কোন সাদি বা সঠিক সীমারেখা নেই। এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের শেষ ঠিকানা পাওয়া যায় না। বুদ্ধ লোকালয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে ভিক্ষুসংঘকে বলেছেন, “অনমত গেগাথং ভিক্ষবে সংসারো। পূব কোটি না পঞঞয়তি, অবিজ্জা নীবর নানং সন্তানং তন্থা সংযোজনা নং সন্ধাবতং সংসরতং” অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, “এ সংসারের আদি অন্ত নেই, এমনকি ইহার পূর্ব সীমা ও দেখা যায় না। কারণ, জীবগণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও সংযোজনের আবরণে আবদ্ধ হয়ে অনন্তকাল সংসারে সংযোজনের আবরণে আবদ্ধ হয়ে অনন্তকাল সংসারে সন্ধাবন সংসরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

এ অনন্ত বিশ্বে বৌদ্ধ দর্শনে সৃষ্টির মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে অবিদ্যাও তৃষ্ণা। এ অবিদ্যা কি তা অনুধাবনে আমাদেরকে উপলদ্ধি করতে হবে। সাধারণ ভাষায় অবিদ্যা মানে না জানা বা অজ্ঞতা। না জানার কারণে এ অবিদ্যা আমাদের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করে। এ মোহের কারণে ক্রমে রাগ অনুরাগের সঞ্চার হয়। যদি সত্ত্বগুণের জানা থাকত যে, এ মোহই আমাদের দুঃখ সমুদয়ের মূল কারণ, তাহলে কিভাবে অবিদ্যাকে দূর করা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত।” কিন্তু অবিদ্যার কবলে পড়ে সত্ত্বগুণ এ বিশ্বে স্মরণাভীত কাল হতে দুঃখ সমুদ্রে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমরা জানি একজন অন্ধলোক অন্ধই। সে কিছু দেখতে পায়না। অবিদ্যা ও অন্ধের মত। সে কিছু দেখেনা বুঝেনা, তাই অবিদ্যা মানে অন্ধ। যার কাজ হলো চতুর্দিকো হাতড়ানো। তেমনি অবিদ্যাচ্ছন্ন লোক না জানার কারণে তৃষ্ণার কবলে পড়ে চারদিকে শুধু হাতড়ায়। অর্থাৎ জাগতিক বিষয় আশয়ের প্রতি তৃষ্ণার জাল বৃদ্ধি হয়। ক্রমে অতলাস্ত দুঃখ সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়। সুতরাং, বুদ্ধের দর্শনে এ বিশ্বজগতে প্রাণীগণের দুঃখের মূল কারণ বা জন্মের বিধান হচ্ছে এ অবিদ্যা। অবিদ্যার কাজ হচ্ছে সত্ত্বগুণের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করে অন্ধকরে রাখা। এ অজ্ঞানতা হেতু জন্ম এবং জন্মেতে জরা, ব্যাধি, মরণ তা সর্বদুঃখ। অর্থাৎ আর্য্যসত্যে বলা হয়েছে জ্ঞানাভাব হেতু উত্তরোত্তর অজ্ঞানতা বৃদ্ধি হয় এ অজ্ঞানতার কারণে তৃষ্ণার জটাজালে সত্ত্বগুণ আটকে যায়। অবিদ্যার উৎপাতন বা অজ্ঞানতা দূরীভুক্ত না হলে তৃষ্ণা নিরোধ সম্ভব হয়না। তাই তৃষ্ণা নিরোধে অবিদ্যা দূরীভূত করার উপায় জানতে হবে।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

জাগতিক দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা ও তৃষ্ণা । প্রাণীজগৎ তথা সত্ত্বগণের সৃষ্টির রহস্যের মূল উপাদান বৌদ্ধ দর্শনে বর্ণিত দ্বাদশ নিদানের এ অবিদ্যা ও তৃষ্ণা । অবিদ্যার কাজ মোহ বা তৃষ্ণার দিকে ধাবিত করা । এ তৃষ্ণা মানে পিপাসা । এ পিপাসা অনন্ত অপরিসীম । এ তৃষ্ণা সত্ত্বগণকে রাগে বা আসক্তিতে পুনঃ পুনঃ পিপাসিত করে । যে পিপাসার শেষ নেই । আর শেষ হয় না বলে জগতে সত্ত্বগণ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করে । তাই রাজকুমার সিদ্ধার্থ জ্ঞান লাভ করে উদান কণ্ঠে বলেছিলেন,

“গৃহকারক! দিটেঠাসি পুন গেহংন কাহসি অর্থাৎ “হে গৃহকারক বা তৃষ্ণা তোমাকে আমি পেয়েছি । তোমার মূল অবিদ্যাকে আমি ধ্বংস করেছি । আর তৃষ্ণার জালে আমাকে আটকাতে পারবেনা ।” মানে জন্মের মূল হেতু প্রত্যয় শেষ হয়েছে । বৌদ্ধ শাস্ত্র বর্ণিত জন্মরহস্য কে বলা হয় পটিচ্চ সমুৎপাদ বা প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি । এ প্রতীত্য মানে প্রসিদ্ধ, প্রখ্যাতি বা প্রত্যক্ষ গোচর হওয়াকে বুঝায় । সৃষ্টির মূল এ হেতু প্রত্যয় । যাকে হেতু মূলক, কারণদীপক বা উপকারক বুঝায় । কেননা, এ সৃষ্টি রহস্য অবগত হলেই ইহা নিরোধের উপায় জ্ঞান হয় । তাই হেতু প্রত্যয় অবগত হতে পারলে বা জন্মের রহস্য জানতে পারলে অবিদ্যা তিরোহিত এবং তৃষ্ণার উচ্ছেদ সম্ভব হয় । তৃষ্ণার উচ্ছেদ হলেই জন্ম মৃত্যুর চিরন্তন খেলা রুদ্ধ হয় । বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাকে দূরীভূত করা বা রোগ সারাতে ঔষধ পানের ন্যায় । এ অনন্ত জগতের সত্ত্বগণের স্রষ্টা এ অবিদ্যা ও তৃষ্ণার মূলোৎপাঠনই বৌদ্ধদর্শনের মূল লক্ষ্য ।

প্রতীত্য নীতি মতে বেদনা হতে তৃষ্ণার জন্ম । দ্বাদশ নিদানে এ তৃষ্ণার জন্মের সাথে তিন প্রকার রূপ ধারণ করে ।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

কামাসব ভবাসব ও বিভবাসব । ইহা আবার ষড়বিধ পর্যায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে ১০৮ প্রকারের হয়ে থাকে । ইহারাই জীবগণকে সংসারে একবার ডুবাচ্ছে ও একবার ভোগাচ্ছে । অবিদ্যা ও তৃষ্ণার এ কার্যকারিতার কারণে জগতে যত দূর্গতি । জীবগণ জগতে বা সংসারাবর্তে এ অবিদ্যা তৃষ্ণার কারণেই জন্ম গ্রহণ করেও মৃত্যু বরণ করে এবং চক্রাকারে, দ্বাদশ নিদানে ঘুর পাক খাচ্ছে । এ বিস্ময়কর নীতি প্রবর্তনের কারণে বুদ্ধের দর্শন সম্যকপথ অনুসারীগণের নিকট পরম পাওয়া । কেননা, কোন ঈশ্বর বা শক্তিধরের নিকট প্রার্থনা বা কামনা করে দুঃখ নিরোধ বা জন্মান্তর নিরোধ করতে হয় না । নিজের অবিদ্যাকে নিজে জ্ঞানার্জনে, ধ্বংস করে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা যায় । তাই বৌদ্ধ দর্শন দার্শনিক জগতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় । কেননা, ব্যক্তি ঈশ্বরের পরিবর্তে বুদ্ধ প্রবর্তিত মহাশক্তি বা তৃষ্ণাকেই স্রষ্টার মূলনায়ক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে । এ অনন্ত বিশ্বের অনন্তকাল হতে প্রাণীজগৎ প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিতে হাবুডুবু খাচ্ছে । এ নীতি বিশ্বে এক চমকপ্রদ অধ্যায় । কেননা, অতীতে ও বর্তমানে এমন দার্শনিকতত্ত্ব কোন মনীষী বা ধর্মপ্রচারক উপস্থাপন করতে পারেননি । সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, বুদ্ধের এ দ্বাদশ নিদান ব্যক্তি নিজেই স্বয়ং উপলব্ধিতে আত্মসুখ লাভ করতে পারেন, এ সুখ প্রাপ্তিতে নিজে নিজেই উদান গাথা ভাষন করেন । যেমন, বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিষ্যগণ করেছিলেন । এখানে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি নিয়ে বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ ভগ্নের একটি উক্তি প্রনিধান যোগ্য । দীর্ঘনিকায়ে ‘মহা নিদান’ সূত্রে আনন্দ ভগ্নে বুদ্ধকে বলেছিলেন, “অচ্চরিয়ং ভগ্নে, অব্ভুতং ভগ্নে, যাব গম্ভীরো চায়ং ভগ্নে, পটিচ্চ সমুপ্পাদো গম্ভীরাব ভাসো চ । অথ পণ মে

উত্তানু কুত্তানুকো বিয় খায়তী'তি । অর্থাৎ বড় অদ্ভুত ভণ্ডে!
বড়ই আশ্চর্য ভণ্ডে! এরূপ গম্ভীর দীপ্তি বা অবভাস পূর্ণ পটিচ্চ
সমুপ্পাদ । অথচ আমার নিকট ইহা অতি অগভীর মনে হচ্ছে ।

বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, “মাহেবং আনন্দ অবচ, মাহেবং
আনন্দ অবচ.... । আনন্দ এরূপ বলো'না । সুদীর্ঘকাল ইহা না
বুঝে সংসার অতিক্রম করতে পারিনি । জরা মরণের
অভিসম্পাদ হতে অবিদ্যার কারণে মুক্ত হওয়া যায়নি ।

বুদ্ধ আনন্দকে এ প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির গম্ভীরতার
ব্যাখ্যা প্রদান করে বুঝালেন যে, জন্ম মৃত্যুর মূল কারণ হচ্ছে এ
প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি অবিদ্যা । এ অবিদ্যাকে জয় করতে না
পারলে সংসার চক্রে নিরন্তর কষ্ট পেতে হয় । জন্ম মৃত্যুর মূল
রহস্য এ প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি উপলব্ধ হলেই অবিদ্যা
দূরীভূত হয় । বুদ্ধ বোধি মূলে এ রহস্য উদ্ঘাটনে উদান গাথা
বলেছিলেন-

“সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং

বিসংখার গতং চিত্তং তন্থানং খয়মঙ্কগা ।”

অর্থাৎ আমি তৃষ্ণা নির্মাতার সমুদয় পার্শ্বক ভগ্ন করেছি এবং
তাতে আমার গৃহকূট বিচ্ছিন্ন হয়েছে । আমার চিত্ত তৃষ্ণার ক্ষয়
সাধন করে সংসার মুক্ত হয়েছে । বুদ্ধ ভব সমূহের আদীনব
তৃষ্ণাকে সমূলে উৎপাটন করে এভাবে আনন্দ গীতি
গেয়েছিলেন । সুতরাং, আমাদের সর্ব দুঃখের মূল ঢাকনা
অবিদ্যার উৎপাটনে তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদে দুঃখ নিবারণ তথা
জন্মান্তর নিরোধের পথে এগিয়ে যেতে হবে । এজন্য চাই,
একাগ্র সম্যক ব্যায়াম । সম্যক ব্যায়ামের দ্বারা অষ্টমার্গের
অনুসরণে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা ও দৃষ্টাসব তৃষ্ণার
উচ্ছেদ করার প্রয়াস চালাতে হবে । এ অকৃত্রিম প্রয়াসে সৃষ্টির

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

মূল সমূহকে কর্তন করতে হবে। তা'তেই জাগতিক দুঃখ নিরসন সম্ভব।

মনে রাখতে হবে যে, চতুরার্য সত্য সম্পর্কে না জানা, প্রতীত্য সমুৎপাদের পূর্বাস্ত-অপরাস্ত বিষয় অবগত না হওয়াই অবিদ্যা। এ অবিদ্যাই আমাদেরকে অন্ধকারে রাখে। অবিদ্যা প্রসূত ক্লেশরাশিই নির্বাণ বা দুঃখ উপশমের অন্তরায়। লোভ, দ্বেষ, মোহ; মান, মিথ্যাদৃষ্টি সন্দেহ, স্তান, ঔদ্ধত্য, পাপে নিলজ্জতা ও নির্ভয়তা এ ক্লেশ রাশিকে অবগত হয়ে অবিদ্যাসরকে নিরোধ করাকেই বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক উপজীব্য বিষয়। ইহাতে সৃষ্টির রহস্য অবগত হয়ে ক্রমে তৃষ্ণার চির নিবৃত্তি হয়।

বৌদ্ধ চিন্তায় সংসারের আদি অন্তের কোন সীমার কথা বলা হয়নি। জগতের আদি নেই অন্ত নেই। সংসার প্রবাহ সংসরণে সদা ক্রিয়ারত। সুতরাং, জগতের স্রষ্টা, সৃষ্ট প্রাণীর আদি, বা লোকালয়ের আদি অন্তের চিন্তা করা নিরর্থক সময় ক্ষেপন মাত্র। আহত ব্যক্তির আগে চিকিৎসা করে তাকে ভাল করার কথা বলা হয়েছে। কিভাবে আহত হয়ে বা কে করেছে এ তথ্য খুঁজতে খুঁজতে সময় ক্ষেপনে আহত ব্যক্তি মারা যাবে। তাই সময় ক্ষেপন না করে চিকিৎসা করাটা উত্তম। জগতের সকল প্রাণী সকল দুঃখ যন্ত্রনার আহত ব্যক্তির মত। আমাদের ব্যথা সারাবার পথ অন্বেষণ করতে হবে। বুদ্ধ সে পথই দেখিয়েছেন। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনে সৃষ্টিকর্তা ও প্রাণী জগৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। যা, অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনের মত ধরে নেয়ার মত নহে। অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনে কল্পনা করে একজন

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধ সেখানে না গিয়ে বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সৃষ্টিকর্তা দেখার মত ব্যবস্থার কথা বলেছেন। যা বিজ্ঞজন ও সুধীজন বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মত একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।

নাম-রূপ :

বৌদ্ধ দর্শন মতে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নাম ও রূপের সমষ্টি মাত্র। শাস্ত্রে ইহাকে বলা হয়েছে ‘নামঞ্চ রূপঞ্চ’ বলে। এ দু’টি সত্তার উপরই জগৎ অনাদি অনন্তকাল হতে নিয়ত প্রবর্তীধর্মী। এ দু’টি সত্তার উপরই বৌদ্ধধর্মদর্শনক্রমে বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সত্তা হেতু প্রত্যয় ধর্মের সমন্বয়ে নিত্য নতুনরূপ ধারণ করে জগতে আবর্তিত হচ্ছে। ফলে বিশ্বে নব নব রূপের সমাগম হয়। এ রূপের স্বভাব হচ্ছে নিগুণতা। উহা চতুমহাভূত দ্বারা নিত্য নবনব রূপ পরিগ্রহ করে। চতুমহাভূত বলতে পৃথিবীধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, আপধাতু, ইত্যাদি পরমাণুর সমাবেশ মাত্র। এ রূপের নিগুণতা হচ্ছে আটটি। সেগুলো হলো কাঠিণ্য, তারল্য, ঔষ্ণ্য, স্পন্দন্য, বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজ। আমাদের এ বর্হিজগতে এ সবই রূপ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, “রূপ্পতীতি রূপং বিরূপভাবং আপজ্জীতি রূপং।” অর্থাৎ রূপ বলতে দ্রব্যের আকার মনে করা হলেও এক্ষেত্রে তা’ নহে। যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখি বা অনুভব করি তা সবই রূপ। এ রূপ অনুতে, মহতে, হ্রস্বে, দীর্ঘে, নিকটে, দূরে, দৃশ্যে, অদৃশ্যে, ইহলোকে, পরলোকে, ভূত ভবিষ্যতে বর্তমানে যেখানে যে আকারে থাকুক না কেন-তা আপন বিপরীত নাম স্বভাবে রূপ। এ রূপ পঞ্চহেতু দ্বারা সাধিত। এ পঞ্চ হেতু হচ্ছে রূপ, রস,

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

গন্ধ, শব্দ, ও স্পর্শ সমন্বয়ে রূপ নামে পরিচিত হয়। দুঃখ আমাদের মানসিক চিন্তা চেতনা হলে ও এর রূপ বিদ্যমান। যেমন আমাদের এ শরীর একটি ব্যাধি মন্দির। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চগুণ চিত্তের আলম্বন হলে চিত্ত সংসারী হয় এবং চিত্ত ত্রিভবে আবদ্ধ থাকে।

মধ্যম নিকায়ে 'মহাহস্তিপদোপম সূত্রে সারিপুত্র ভণ্ডে ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে দেশনায় বলেছিলেন, চারি মহাভূতের কারণেই এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। এর মধ্যে পৃথিবী ধাতুর, দু'রূপ। অধ্যাত্ম ও বাহ্য। যা অধ্যাত্ম তা ব্যক্তিগত, স্তব্ধ, খরও উপাদত্ত বা কেশ, লোম, নখ, দন্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক হৃদয়, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, উদর ইত্যাদি অধ্যাত্ম বিষয়। অর্থাৎ যা জীবের দেহান্তর্গত তা'ই অধ্যাত্ম বিষয়। বাহ্য অর্থে জড় বস্তু বুঝায়। যথা, লৌহ, ত্রপু, শীষা ইত্যাদি। তেজধাতু অধ্যাত্ম ও বাহ্য দু'টোই হয়। তেজধাতু অর্থে যা জীর্ণ করে, পরিদাহ বা পরিপক্ব করে এবং নগর জনপদ দক্ষ করে তাই তেজধাতু। বায়ুধাতু বলতে ও অধ্যাত্ম ও বাহ্যকে বুঝায়। বায়ু উর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী কিংবা শহর নগর জনপদ উড়িয়ে নেয় এমন বায়ুকে বুঝায়। আপধাতু অর্থে যা পিন্ড, শ্রেণ্মা, মূত্র ইত্যাদি। ইহা ও অধ্যাত্ম ও বাহ্য হতে পারে। জনপদ নগর ইত্যাদি সময়ে সময়ে ভাসিয়ে নেয়, আপধাতু। এ রূপের উপর ক্রিয়ারত থাকে অন্তর্জগত চিত্ত চৈতসিক বা নাম। নাম বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ভেদে চার প্রকার। এ নাম চতুষ্ঠয় ক্রমে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মোহ, লোভ ইত্যাদি চৈতসিক অবস্থায় পরিণত হয়ে থাকে। ঐ পরিণামের হেতু জন্মান্তরের কর্ম বীজের সূচনা হয়। নিগুণ জড় বস্তুর উপর

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

চিত্ত ক্রিয়াশীল হলে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা দ্বারা বহুবিধ কল্পনার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ রূপের উপর আশ্রিত হয়ে নামের প্রবর্তন হয়। এ সংযোগ হেতুই হচ্ছে হেতু প্রত্যয় বা হেতু পচয় ধম্মো। যা প্রাণী জগতের সৃষ্টির হেতু বা মূল্য কারণ। চিত্ত চৈতসিকের স্বভাব হচ্ছে অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। এ অবিদ্যা পঞ্চ হেতু বা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা আশ্রিত হয়ে নব নব সংস্কার বা কর্মবীজ উৎপাদন করে। পঞ্চ হেতুতে অবিদ্যা, তৃষ্ণা উৎপাদন ও চৈতসিক যোগে সংস্কার উৎপাদন করে কর্ম প্রত্যয় বা নামরূপ পরিগ্রহ করে। এতে রূপ শব্দাদি তৃষিত হয়ে জড়জগতে নব কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বিজ্ঞানাদিত পঞ্চফল বা অর্ন্তজগৎ গঠিত হয়। ফলে ভবফল বা নবকর্মে জন্ম এবং জন্মের কারণে মরণ বা মরণ স্কন্ধ সৃষ্টি হয়। এভাবে বৌদ্ধ চিন্তাধারনার আলোকে জগৎ সৃষ্টি ও প্রাণী জগত অনন্তকাল হতে সংসারে সঞ্চরণ হয়ে আসছে।

অবিদ্যার কারণে যে তৃষ্ণা বিষয়াসক্তির সৃষ্টি হয় একেই নাম রূপ বলা হয়। এখানে নাম অর্থে অর্ন্তজগত বা চৈতসিক অবস্থাকে বুঝায়। ‘রূপ’ বলতে বর্হিজগৎ ও উহাদের রূপান্তর ক্রিয়াকে বুঝায়। সুতরাং, বৌদ্ধ দর্শন মতে নাম ও রূপের সক্রিয়তার কারণেই এ বিশ্বরূপ। বিশ্বের যত সৃষ্টি ও ক্রিয়া কাণ্ড সবই এ নাম রূপের কারণেই হচ্ছে। এতে অন্য কোন আধ্যাত্মিক শক্তি বা কোন শক্তিধরের হাত নেই। কোন একক সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা নেই। নাম রূপের কারণেই এ পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ। সুতরাং, বৌদ্ধ চিন্তাধারায় কথা হচ্ছে জগতের সব কিছুর মূল হচ্ছে নাম-রূপের কার্যকারিতার প্রতিফলন। কোন অলৌকিক ক্ষমতা ধরের ঐশী শক্তির হাত নেই। জগতের

কার্যকারণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বা হেতুপ্রত্যয় ধর্মের কারণে এ জগৎ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণীজগৎ নাম রূপের কারণেই ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় রত এবং প্রাণী জগৎ ভোগলালসাতেই ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ বিষয়শক্তির কারণেই জগতের প্রাণীকুল নিরন্তর দুঃখ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এ দুঃখ যন্ত্রণার নিরসন প্রক্রিয়া কিভাবে সম্ভব তা ভেবেই প্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞানীগণ চিন্তা করে বিভিন্ন মতবাদ তথা ঈশ্বর ভগবান বা মহান ক্ষমতাধরের চিন্তা কল্পনা করে আসছেন। বিশ্বের প্রাচীন ধর্ম দর্শন সমূহে যদিও মহান স্রষ্টার কল্পনা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার কথা আছে, তা বুদ্ধ স্বীকার করেননি। তিনি উল্লেখিত নাম রূপের উপর জগতের সার্বিক কার্যক্রম উপলব্ধি করে কার্যকারণ বা হেতু প্রত্যয়ের উপর বিশ্বের সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বে এক অভিনব দর্শন খাড়া করেছেন। যা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর দর্শন। বৌদ্ধমতে এ সংসার রচনার প্রবৃত্ত ঈশ্বর নহে, অবিদ্যা প্রসূত তৃষ্ণাই এ সংসার রচনার মূল। যা চৈতসিকের অর্ন্তভুক্ত বা সত্তার চিন্তা চেতনার ফল। এখানে অবিদ্যা অর্থে সত্যের অনুপলব্ধিকে বুঝায়। অবিদ্যাতে তৃষ্ণা চেতনা হয় এবং তাতে বিভিন্ন কর্ম প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সংসারের অসংখ্যজীব ও বস্তু অনুকূল হেতু প্রত্যয়ের সাহায্যে বিবিধ শক্তি বা সত্ত্বরূপে আর্বিভূত হয়। যেমন, অতিক্ষুদ্র বীজ অনুকূল হেতুপ্রত্যয়ে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়ে ফলমূল প্রদান করে। তাই বৌদ্ধ চিন্তায় সংসারের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। আদি বা অন্ত নিয়ে ভাবনা করা হয় না। কেননা, সংসার জাত বা অজাত নহে। উহা কার্যকারণের প্রবাহ মাত্র এবং এ প্রবাহ হেতু প্রত্যয়ের অধীন। এখানে স্রষ্টা নামক এক শক্তিধরের চিন্তা নিরর্থক। বৌদ্ধমতে জীব ও জগৎ

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

অদ্বয় বা মধ্য বিকাশ মাত্র । নাম ও রূপ সমষ্টিতেই এ বিশ্ব ।
যেমন অচির বিদ্যমানে আভা হয় । আভার বিদ্যমানে অর্চি দৃষ্ট
হয় । উভয়ের অন্বেয়ে প্রদীপ । সুতরাং জীব জগৎ নাম ও রূপের
অন্বেয় মাত্র । তাই বলা যায়, সংসার সৃষ্ট বা অসৃষ্ট নহে ।
অভিনবাকারে প্রবর্তমান মাত্র ।

বৌদ্ধ দর্শনে নাম ও রূপ ব্যতীত অপর কোন সত্ত্বা
স্বীকৃত হয়নি । সাধারণত রূপকে আশ্রয় করে নামের প্রবর্তনের
কথা বলা হয়েছে । উহারা পরস্পর বিভিন্ন সংযোগে হেতুপ্রত্যয়
লাভ করে । তাই বলা হয়েছে, নাম রূপই জীবের জন্মের প্রথম
সূত্রপাত । ইহাই আমি এবং আমার রূপে বিদ্যমান । আমি না
হলে আমার কথাটি আসেনা । এ দুটি ব্যবহার সত্য ।

বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে চিন্ময় বা জ্ঞানময় বলা হয়েছে ।
এ ব্রহ্মা জ্ঞানময় বা বেদনা সম্পন্ন হলে আমার বাইরে নয় ।
তিনি আমার মধ্যেই বিদ্যমান । সুতরাং, আমি বা আমাতেই
সৃষ্টির স্বভাব যেমন রয়েছে তেমনি ব্রহ্মাতেই রয়েছে । সুপ্তে বা
জাগরনে অবিরাম সৃষ্টি প্রবাহ চলছে । এখানে নায়ক আমি,
প্রেত আমি, দেবতা আমি, ব্রহ্মা আমি । এ ব্রহ্মা ‘আমিই যদি
স্রষ্টা হন তা হলে আমি ও আমার স্রষ্টা হতে পারি । অতএব,
বলা চলে এজগৎ শুধুমাত্র নাম রূপের প্রবাহ মাত্র । অনন্তকাল
হতে এ প্রবাহের কার্যকারণ চলছে । আমাদের অন্তর্জগৎ অনন্ত
শক্তির উৎস । ইহা রূপে বিবর্তিত হয়ে বর্ণ বৈচিত্র্যে, আকারের
বৈচিত্র্যে, ভাবের বৈচিত্র্যে, ক্রিয়া বৈচিত্র্যে, গতি বৈচিত্র্যে, জীব
বৈচিত্র্যে প্রকাশ পায় মাত্র । যেমন, মাটি পাথরের, পাথর মণি
মাণিক্যের রূপ লাভ করে সংবর্তন বিবর্তন লাভ করছে । তেমনি

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

মাধ্যাকর্ষন জড় শক্তি হেতু প্রত্যয় জড় জীবে পরিব্যাপ্ত হয়ে মহাশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে অনন্তকাল থেকে । সুতরাং, ইহা জাগতিক ধর্মের জাগতিক ক্রিয়া । নাম ও রূপ পরস্পর আশ্রিত । একটির পতন হলে অন্যটির পতন হয় । নাম নিস্তেজ বা তার নিজস্ব কোন শক্তি নেই । আবার নামের অবিদ্যমানতায় রূপ ও নিস্তেজ হয় । উভয়ে পরস্পর আশ্রিত হলেই জীব বা সত্ত্বের সৃষ্টি হয় । যেমন, ভেরী এক এবং শব্দ অন্য । এখানে ভেরী রূপ, শব্দ নাম । উভয়ে পরস্পর আশ্রিত হলেই ভেরীতে আঘাতে শব্দ হয় । তেমনি নাম ও রূপ পরস্পর আশ্রিত হয়েই হেতু প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে । আমরা ‘রথ’ বলতে একটি শব্দ দেখি । অথচ বিবিধ উপকরণ সহযোগে রথ । তেমনি নাম ও রূপ স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু পরস্পর আশ্রিত । রূপের উপাদান হচ্ছে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরৎ ও বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ ইত্যাদি । রূপ অসংখ্য পরমাণুর বিবিধ বিবিধ সহযোগে বিবিধাকারে সমুৎপন্ন হচ্ছে, তেমনি নাম ও বিবিধ চৈতসিকের বিবিধ সংযোগে প্রকাশ পাচ্ছে । অর্থাৎ নামরূপ হেতু প্রত্যয়ে পূর্ণতা পাচ্ছে । নামরূপের বিদ্যামানেই হেতু প্রত্যয় । যেমন বৃক্ষের বিশালত্বের উপাদান হচ্ছে তার খাদ্য প্রবাহ । খাদ্য প্রবাহে নিরুদ্ধ হলে বৃক্ষের গতি থাকেনা নিরুদ্ধ হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, হেতু ও প্রত্যয় সমার্থক নয় । হেতু হচ্ছে মূল নিদান বা বীজ । ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরৎ প্রত্যয়ে এ বীজ রক্ষা হয় । সুতরাং, ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি হচ্ছে প্রত্যয় । আমরা জানি নৌকাকে আশ্রয় করে মানুষ সমুদ্র যাত্রা করে । এখানে নৌকা হচ্ছে ‘রূপ’ আর মানুষ হচ্ছে নাম । এখানে নৌকাটি চলছে মানুষ নামক সত্ত্বার প্রত্যয়ে । আদিকাল থেকেই এ নাম রূপকেই জীব মনে করা হয় । অথচ, এ নাম রূপ পরিগ্রহে বা ফল লাভে

জন্মান্তরের তৃষ্ণার সমষ্টি বিদ্যমানতা রয়েছে। যে তৃষ্ণার কারণেই সত্ত্বার জন্ম হয় এবং জাগতিক সুখ-দুঃখ উপলব্ধি হয়। বিশ্বের দর্শন সমূহের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধ দর্শনই বলছে যে, অবিদ্যার উপলব্ধিতে তৃষ্ণা ক্ষয়ে নাম-রূপের নিরোধ সম্ভব হয়। অর্থাৎ জন্মান্তর প্রক্রিয়া নিরোধ বা শেষ করা যায়। সুতরাং, জন্মান্তর মানেই দুঃখ এবং জন্মান্তর প্রক্রিয়া নিরোধ করাটা বিরাট ব্যাপার। একমাত্র বৌদ্ধ দর্শন এ আশ্বাস বাণী দিয়েছেন বলে এ আশ্বাস বাণী বিশ্বের বিস্ময়। কেননা, কারও শক্তিতে বা ইচ্ছায় নহে। শুধু মাত্র স্বীয় প্রচেষ্টায় এ নিরোধ সম্ভব। তাই পণ্ডিতগণ বলেন-

‘বুদ্ধং ঞ্জাণং মনন্তংহি আকাসা বিপুলংসম,
কল্পয়ো কল্পভাসন্তং নচ বুদ্ধ গুণকখয়ং।’

কোনরূপ মহাশক্তির নিকট প্রার্থনায় বা নতজানু হয়ে সুখ কামনায় কারও কোন লাভ হয় না। শুধুমাত্র স্বকীয় প্রচেষ্টায় নাম রূপ উপলব্ধিতে অবিদ্যা বা বিষয়াসক্তির হেতু প্রত্যয় জেনে সম্যক উপলব্ধিতে দুঃখের উপশম হয়। এ জাগতিক দুঃখ উপশমই বৌদ্ধ দর্শনের মূল উপজীব্য বিষয়। জাগতিক দুঃখ জানার উপায় বা পথ খোজাই হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের লক্ষ্য। এ উপায় যিনি অবগত হন তাকে শ্রোতাপণ্ডি ফল লাভী বলা হয়। সুতরাং, এ ফল লাভে ব্যক্তিকে একাগ্র সাধনায় অষ্টমার্গ পথ সম্পর্কে অবগত হতে হয়। এখানে কোন শ্রুতি বা শক্তির সাহায্য লাগে না। নিজের আয়ত্বকৃত এ প্রচেষ্টাকে বলা হয় মহাশক্তি। কোন ভগবান বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে এ জ্ঞান লাভ হয় না। তাই বলা হয়েছে নিজের কৃত কর্ম বীজই হচ্ছে বৌদ্ধমতে শ্রুতি বা মূল চালিকা শক্তি। এ কর্মই হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের ঈশ্বর বা সর্ববি নায়ক।

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

অবিদ্যা বা তৃষ্ণার যেমন আদি অন্ত নেই তেমনি সংসারেরও আদি অন্ত নেই। সংসার, জীবজগৎ, তথা মানবজাতি হচ্ছে কার্যকারণের প্রবাহ হেতু প্রত্যয়ের প্রবাহ মাত্র। যেমন, ক্ষুদ্র বীজ বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে ক্রমে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। তেমনি প্রাণীজগৎ ও অনাদি ও অনন্ত কারের কর্ম প্রবাহের কারণে বা হেতু প্রত্যয় ধর্মের উপাদানে জন্মান্তর পরিগ্রহ করে জন্ম গ্রহণ করে। আবার উপাদানের অভাবে যেমন ক্ষুদ্রবীজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হতে পারেনা তেমনি হেতু প্রত্যয়ের অভাব হেতু জীবন প্রক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। এ নিরুদ্ধতাই বৌদ্ধ দর্শনের মহাদান। ইহাতেই বৌদ্ধ দর্শন বিশ্বে অভিনবত্ব লাভ করেছে। এর নির্দেশনাতেই বৌদ্ধ দর্শন, বিশ্বের অপারাপর দর্শন হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক মহা দার্শনিক তত্ত্ব। জন্মান্তরের হেতু প্রক্রিয়া বা তৃষ্ণাকেই নিরুদ্ধ করাই বৌদ্ধ মতবাদের মূলকথা। অতীতের পঞ্চহেতুকেই নিরুদ্ধ করাই হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের মূল উপজীব্য বিষয়। বুদ্ধ বলেছেন-

“অতীতে হেতুরো পঞ্চ, ইদানি ফল পঞ্চকং

ইদানি হেতুবো পঞ্চ আয়তিকং ফল পঞ্চকন্তি।”

অর্থাৎ অতীতের পাঁচ হেতু বা অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্মভবই প্রাণীজগতের জন্মান্তরের কারণ। এ পঞ্চ হেতুর ফল বর্তমানের পাঁচ প্রকার ফল। যাকে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা বলা হয়। আবার বর্তমানের পাঁচ হেতু হচ্ছে, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার। এ পঞ্চ কারণ বর্তমানে সংক্রমণ হেতু পঞ্চফলের জন্মদেয়। একথা বলা যায় যে, অতীতের হেতুর কারণ নাম রূপের কর্তা।

সংসারে সংক্রমণ বা হেতু প্রত্যয় ধর্মঃ

বৌদ্ধ তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে প্রাণীগণ আপন আপন কর্ম প্রভাবে বা চিন্তের স্বভাব বশে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ গ্রহণ করে। ত্যাগকে আমরা মৃত্যু বলি। প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান চিন্তের মাধ্যমে প্রাণী জন্মান্তর গ্রহণ করে। জীবের এ জন্মান্তর বা সঞ্চরণকেই সংসার বলে। এ সঞ্চরণ অসংখ্য ও ভিন্ন ভিন্ন বলয়ে হয়। যা আধুনিক বস্তু বিজ্ঞানের অসংখ্য সৌরমন্ডলের অস্তিত্বের সাথে তুলনীয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে জীবনের অস্তিত্বের পরিচায়ক এ রকম অসংখ্য সৌরমন্ডলের সংখ্যা কোটি সহস্র চক্রবাল। এক এক চক্রবালে যে সকল প্রাণী বিদ্যমান-তাদেরকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়। যথা, মানব লোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি। এ চক্রবালে অবস্থানকারী দেবমানবের স্থানকে সুগতি ভূমি বলা হয়। অন্যদিকে প্রেতলোক, তির্য্যক লোক, অসুরলোক ও নরলোককে বলা হয় দুর্গতিভূমি। আধুনিক বিজ্ঞান সৌরজগতের রহস্য উন্মোচনে বিবিধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং নব নব গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কার করছে। বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর পূর্বে এরকম অসংখ্য গ্রহের কথা তথা চক্রবালের বিষয় বলে গেছেন। সুতরাং, বুদ্ধের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞা বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের চেয়ে অত্যাধিক শক্তিশালী। যা আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের অতীত বা যা কখনও বোধগম্য হবার নহে। তাই এ বিশ্ব ব্যাখ্যা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বুদ্ধ যে চারি মহাভূতের কথা বলেছেন, তার সৃষ্টির আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক রহস্য হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদানে যা প্রধানত ৪ টি উপাদানের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। এ চারিটি উপাদান মাটি, জল, বায়ু ও তাপ। বৌদ্ধ পরিভাষায় যাকে বলা হয়

পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু । যার মধ্যে রয়েছে বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ বা শক্তি । এ সমস্ত উপাদানে বা নৈসর্গিক সমন্বয়ে বিবর্তনের বিশেষ স্তরে এক এক প্রজাতির চিহ্ন ক্রিয়া জন্ম নিয়ে থাকে । এ চিহ্ন ক্রিয়ায় প্রাণীজগতের কেউ দেবলোক, কেউ মনুষ্যলোক, কেউ তির্য্যক, লোকে, কেউ প্রেতলোকে এবং কেউ নিরয় লোকে জন্ম গ্রহণ করে । সংসার সঞ্চরণে জীবের এ পঞ্চগতি হয়ে থাকে । এতে সত্ত্বগণের কৃত কর্মবীজের ফলই সত্ত্বগণের গতি নির্ধারণ করে এ সঞ্চরণ প্রক্রিয়ায় কেউ গতি বা দিক ঠিক করে দেয়না । স্ব স্ব কৃত বা চিহ্ন ক্রিয়ার কারণে জীবের গতি অটোমেটিক নির্ধারিত হয় । তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

কম্মসুস কারকোনখি, বিপাকসুস চ বেদকো,
সুদ্ধধর্ম পবত্ততি এবমেতং সম্মদসুসনং,
এবং কম্মং বিপাকে চ বত্তমানে সহেতুকে,
বীজ রুক্ষাদিনং পুব্ব কোটি ন ঞ্জায়রে ।

অর্থাৎ কর্মের কর্তা বিজ্ঞান, ফলভোগী সে বিজ্ঞান, কার্যকারণ প্রবাহিত হচ্ছে, ইহা চিহ্ন চৈতসিক ব্যাপার মাত্র । ইহার এক সঙ্গে উদয় ও বিলয় হয় ।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, সংসারের অবিদ্যা ও ভব তৃষ্ণা এবং আদ্যন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানে দৃষ্ট হয়না ।” অথচ এ সংসারেই ঐতিহাসিক কাল হতে সর্বত্রই আবর্তন বিবর্তন এবং জীবগণের জন্ম মৃত্যু তথা জীবন ধারা পরিলক্ষিত হয় । এ বিবর্তন প্রক্রিয়াই হেতু প্রত্যয় । পালি ভাষায় বলা হয় “পটিচ্চ সমুপ্পাদ ধম্মা” । কখন থেকে এ বিবর্তন কার্যক্রম শুরু হয়েছে তার কোন ঐতিহাসিক তারিখ বা সময় নেই । অনন্ত কাল থেকে এ আবর্তন বিবর্তন চলছে । ‘সংযুক্ত নিকায়ে’

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

‘অনমতগ্গ’ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, “সংসার অনাদি অনন্ত, এ আদিঅন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অতীত। যেখানে সংসারের সঞ্চরণ সেখানেই অবিদ্যা ও ভব তৃষ্ণার অস্তিত্ব ও কার্যক্রম। এ সঞ্চরণ প্রক্রিয়ার অপর নাম কার্যকারণ বা হেতু পচয় ধম্মা বা প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি। এ সঞ্চরণে জীবকুল অভিজ জরায়ুজ, সংশ্বেদজ ও ঔপপাতিক রূপে জন্ম গ্রহণ করে। যেভাবে বা যে প্রক্রিয়ায় জন্ম গ্রহণ করুক না কেন প্রাণীকুলের কর্মবিপাক সহজে শেষ হয় না। স্বর্গ-নরক, তির্য্যক বা ঔপপাতিক রূপে জন্মে গ্রহণ হতে পারে তবে কর্ম সঞ্চরণ অব্যাহত থাকে। এখানে প্রাণীকে কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসবে আকড়ে রাখে। এ ত্রি আসবে আচ্ছন্ন প্রাণী শুধু স্বকীয় চিন্তাজ কর্মে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ ঘুরপাক ক্রিয়া কর্মেই সৃষ্টি রহস্য নিহিত। যা শুধুমাত্র তৃষ্ণা বিমুক্তগণ অবগত হন।

মধ্যম নিকায়ে ‘ক্ষুদ্র সকুলপ্রাণী’ সূত্রে বুদ্ধ সকুলদায়ী পরিব্রাজককে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ‘সকুলদায়ী’, তুমি পূর্ব্বকোটি চিন্তা রেখে দাও। মনে রেখ, উহা থাকলে ইহা হয়, উহার উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি হয়। উহা না থাকলে, ইহা থাকে না, উহার নিরোধে ইহার নিরোধ হয়।” এ উহা হচ্ছে হেতু এবং ইহা হচ্ছে প্রত্যয়। এ হেতু প্রত্যয় ধর্মের কারণেই জগতের সার্বিক কার্যক্রম। বৈজ্ঞানিকেরা যাকে বলেন Law of Causation বা কার্যকারণ নীতি। বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের পালি ভাষায় বলা হয়েছে, ‘ইমস্মিং সতি, ইদং হোতি। ইমস্সুপাদো ইদং উপ্পজ্জতিং ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধো ইদং নিরুজ্জতি।’

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

অর্থাৎ উহা বা তৃষ্ণার বিদ্যমান সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলে আসছে এবং তাতেই অবিদ্যায় নিমজ্জিত হয়ে জীবকুল কর্মজ ফল ভোগ করছে। এ অনন্ত কালের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার খেলাকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানে প্রতীত্য সমুৎপাদ বলা হয়।

প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিতে বলা হয়েছে, তৃষ্ণা বা কামনাতেই অবিদ্যার সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে সংস্কার কার্যের উৎপাদনে ক্রমে বিজ্ঞানের হয়ে ছি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ হয়েছে বা সংস্কার কার্য বা বিজ্ঞানই হচ্ছে সৃষ্টির মূল। যা নামরূপ ধারণ করে ব্যক্তি বিশেষের উদ্ভবের কারণ হয়। নামরূপ থাকলেই ইন্দ্রিয়ের সাথে তৎতৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্বন্ধ হয়। ইন্দ্রিয় বা ছয় আয়তনের তৎ তৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্বন্ধ বা যোগাযোগ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটন প্রতিঘটন দ্বারা স্পর্শ হয়। এ স্পর্শতার কারণে বস্তুজ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং সুখ দুঃখানুভূতির সৃষ্টি হয়। এ সুখ দুঃখানুভূতিতে ক্রমে বেদনা হয়। বেদনা জ্ঞানে ঐ স্পর্শ জনিত বস্তুর প্রতি আকাংখা বা তৃষ্ণা জন্মে। এ তৃষ্ণাই হচ্ছে বুদ্ধ বর্ণিত ‘উহা’। এ উহাতে আবার উপাদানের উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে উপাদানের আসক্তি জন্মে। এ আসক্তির কারণেই ‘ইহা’ বা ভব হয় বা জন্ম হয়। এভাবে প্রাণীজগতের কর্ম ও উৎপত্তির স্বরূপ উন্মোচিত হয়। এ ‘হেতু প্রত্যয়ই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। যাকে বুদ্ধ ‘উহা’ ‘ইহা’ দিয়ে সকুলদায়ীকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। এ উৎপত্তির স্বভাব প্রক্রিয়ার অপর নাম জন্ম বা ভব বলা যায়। এ জন্মের কারণে প্রাণীদের জরা, ব্যাধি, ও মৃত্যুর কারণ হয়। এ মৃত্যুর কারণ হতে জগতে অনন্তকাল হতে শোক, পরিদেবন ও নৈরাশ্যের সঞ্চরণ চলছে। এ শোক তাপ পরিদেবন ও নৈরাশ্যই বিশেষ

চিন্তাবিদগণকে উৎকণ্ঠিত করেছিল, করেছে, এবং করতে থাকবে। এতে উৎকণ্ঠার ঔষধ একমাত্র বুদ্ধ আবিষ্কার করেছিলেন বলে তিনি জগতে ‘জ্ঞানী’ অভিধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধ ঔষধ আবিষ্কারের আগে রোগের উৎপত্তির বিষয় প্রক্রিয়া অবগত হয়েছিলেন। এ উৎপত্তির প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি বা হেতু প্রত্যয় ধর্ম। সুতরাং, হেতু প্রত্যয় ধর্ম অবগত হয়ে ক্রমে এগিয়ে গেলেই ঔষধ পাওয়া যায়। যা’তে রোগ বা তৃষ্ণা বা দুঃখ নিরোধ হয়। সুতরাং, এখানে কোন মহাশক্তি ধরের অলৌকিক শক্তির বালাই নেই। অভিধর্ম পিটকের ‘বিভঙ্গে’ জগৎ উৎপত্তি ও প্রাণীর জন্মের এ তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ, পরবর্তী কালে বিশুদ্ধিমার্গ নামক গ্রন্থে উৎপত্তি ও নিরোধের মূল হিসেবে এ হেতু প্রত্যয় ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিভিন্ন যুক্তি উপমা দিয়ে বুদ্ধের এ মহান তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুগ্ধকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মূহূর্তে যা দুগ্ধ পরবর্তীতে ইহা দধি, পরক্ষণে নবনীতে পরিণত করা যায়, এখানে দুধ ও দধি এক নয় আবার অভিন্ন ও নয়। পালিতে বলা হয়েছে ‘ন চ সো, ন চ অঞ্ঞা।’ বস্তুত দুধ ও দধি এক। দুগ্ধ যেমন প্রতীতি, দধি তেমন প্রতীতি। দু’টো কিন্তু এক নয়। দধিকে দুগ্ধে পরিণত করা যায় না। যদিও দুধ প্রতীতি। তাই বর্তমান প্রতীতি ও পূর্বের প্রতীতি এক নয়। আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নয়। ইহাই প্রতীত্য সমুৎপাদের তথা জগতের নিয়মধারা।

আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর ‘অথ সালিনী’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, প্রত্যয় সামগ্রী বা কারণ সমবায়েই ঘটনা ঘটে কার্যোৎপত্তি হয়।

এক কারণ বা বহু কারণবাদ বিরোধী প্রতীত্য সমুৎপাদ । ইহা এক কারণবাদ । যেমন, চক্ষু, রূপ ও চক্ষু বিজ্ঞানের সংযোগে স্পর্শোৎপত্তি হয় । এভাবে প্রতীতিতে যখন একটি বিষয় ঘটে তখন ইহাকে প্রতীত্য সমুৎপাদ বলা হয় । মূলত হেতু প্রত্যয় তা অর্থে বুঝায়, কারণ বশতঃ কোন কার্য হওয়া । কারণ ছাড়া কোন কার্য হয় না । ‘মহাতৃষ্ণাক্ষয়’ সূত্রে বলা হয়েছে যে, কারণ বশতঃ উৎপন্ন হয় । এমনি কিছু হয় না । পালিতে উল্লেখিত হয়েছে, “পচ্চয়ং পটিচ্চং উপ্পজ্জতি” অর্থাৎ প্রত্যয়েই প্রতীত্য বা কারণেই উৎপত্তি । এ অর্থেই প্রতীত্য সমুৎপাদ । এ সূত্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে উহা থাকলে ইহা হয়, ইহার উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি হয় ।

আর্য্যপর্য্যোসন সূত্রে উক্ত হয়েছে যে, বুদ্ধ হেতু প্রত্যয়তা প্রতীত্য সমুৎপাদ ও সংস্কার বিমুক্ত তথা পরিবজ্জিত, তৃষ্ণাবিরাগ ও নিরোধ নির্বাণ অবগত হয়ে এ নীতি প্রবর্তন করেছেন । তিনি এ বিমোক্ষ পথ অশ্বেষণে গম্ভীর, দূদর্শ, দূরণ্যবোধ্য, শান্ত প্রণীত ও তর্কাতীত এ প্রতীত্য নীতি আবিষ্কার করে বিশ্বকে স্তুতিত করেছেন । সাথে সাথে দুঃখ মুক্তির ব্যবস্থা করে এক মহত্ত্বের ধারণা দিয়েছেন । এ বিস্ময়কর ধারণাই সম্যক বৌদ্ধ দর্শন বা মুক্তির প্রকৃত পথ । কোন স্রষ্টা বা দেবতা বা অলৌকিক শক্তি এখানে কাজ করে না । হেতু প্রত্যয় নীতিতে জাগতিক কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে এবং ঘটতে থাকবে ।

মধ্যম নিকায়ে আর্য্যপর্য্যোসন সূত্র ও মহাসত্যক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, বুদ্ধের আগে কোন কোন মহাযোগী ধ্যান ও সাধনা বলে অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান লাভ করে ছিলেন । এ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় । কিন্তু চির নিবৃত্তি হয় না । বুদ্ধের সময়

ঋষি আলাড় কালাম অকিঞ্চন আয়তন নামক তৃতীয় ধ্যান বা সপ্তম সমাপত্তি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আর একজন মহাযোগী রামপুত্রক রুদ্রক নৈব সংজ্ঞা-না সংজ্ঞা আয়তন নামক চতুর্থ অরূপ ধ্যান বা অষ্টম সমাপত্তি জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি জ্ঞান লাভে পরম প্রীত হয়ে তাঁর লব্ধ জ্ঞান প্রচারে করতেন। সিদ্ধার্থ তাঁদের কাছে গিয়ে এ শিক্ষা আয়ত্ত্ব করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, এতে বিমুক্তি নেই। তৃষ্ণার ক্ষয় হয় না। কোটি কোটি বছর ব্রহ্মবাস করার পর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এ তত্ত্ব উপলব্ধিতে সিদ্ধার্থ তাঁদের ছেড়ে মুক্তি জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি উরুবেলায় গিয়ে একাকী বিভিন্ন স্থানে একাগ্র সাধনা করেন। ক্রমে তিনি এমন জ্ঞান বা মহাতত্ত্ব আবিষ্কৃত করেন-যাকে বলা হয় ‘সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ’ জ্ঞান বা নবম সমাপত্তি জ্ঞান। এ নবম সমাপত্তি জ্ঞানের মূল তত্ত্ব হচ্ছে বিমোক্ষ বা বিমুক্তি। এ বিমুক্তি জ্ঞান লাভ হয়েছে তাঁর হেতু প্রত্যয় তত্ত্ব অর্জনে। তিনি সম্যক ভাবে উপলব্ধি করেন যে, জাগতিক সর্বদুঃখের মূল হচ্ছে প্রতীত্য সমুৎপাদ বা হেতু প্রত্যয় ধর্ম এবং হেতু প্রত্যয়ের নিরোধেই বিমুক্তি বা বৌদ্ধ দর্শন। সুতরাং, প্রাচীন ভারতীয় মতাদর্শের উপায় নবম সংজ্ঞা বেদয়িত জ্ঞানই বুদ্ধগণের বুদ্ধজ্ঞান, তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

অচিন্তিয়া বুদ্ধা, বুদ্ধা ধম্মা অচিন্তিয়া

অচিন্তয়েসু পসন্নেন বিপাকোচ অচিন্তিয়ো।

দীর্ঘ নিকায়ে ব্রহ্মজাল সূত্রে প্রতীত্য সমুৎপাদের বিপরীত একটি মতবাদের উল্লেখ আছে। ইহাকে বলা হয়েছে, ‘অধীত্য সমুৎপাদ’ নীতি। এমতবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, “অহং হি পূর্বে না হোসি, সোস্থি অহত্ত্বা সত্তন্তয়ে পরিণতোতি।”

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

অর্থাৎ আমি পূর্বে ছিলাম না পূর্বে না হয়ে এখন আমি সত্ত্ব
পরিণত হয়েছি। এ মতবাদ গ্রহণ যোগ্য নহে। কেননা, পূর্বের
না থাকলে এখন সত্ত্ব বা জীব হয় না। দুধ ছাড়া যেমন দধি
হয়না। তেমনি পূর্বেকার উপাদান বর্তমানের সত্ত্ব।

অধীত্য সমুৎপাদ আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয়
চিন্তাধারায় আর এক চিন্তাবিদ বা ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা
বলা যায়। এ উপনিষদের চিন্তাবিদ ঋষি উদ্ধালক বলেছেন,
“সৎ অগ্নে ছিল এক ও অদ্বিতীয়। সৎ ইচ্ছে করে বহু হয়েছে।
সৎ ইচ্ছে করে তেজ, অপ, পৃথিবী ও বায়ু সৃষ্টি করে। ঐ সৎ
বা দেবতা বীজে অনুপ্রবেশ করে ক্রমে নাম রূপ বা ব্যক্তিত্বের
প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই বৌদ্ধ চিন্তার সাথে প্রাচীন ভারতীয়
চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য। উদ্ধালক যে স্রষ্টার কথা বলেছেন,
বৌদ্ধ দর্শনে সে স্রষ্টা হচ্ছে কার্য কারণ বা হেতু প্রত্যয়। কোন
সৎ বা দেবতা এখানে কোন কাজ করে না। অনন্ত কার্যের
কার্যপ্রবাহ বর্তমানের এরূপ বা বীজ। আবার প্রাচীন আর এক
তৈত্তিরীয় উপনিষদে আর এক মতবাদ রয়েছে। এ উপনিষদের
মতে অসৎ বা ব্রহ্ম অগ্নে ছিল। এ ব্রহ্ম হতেই ক্রমে জাগতিক
সব কিছু তথা প্রাণী জগতের সৃষ্টি। আবার কোন কোন
উপনিষদে বলা হয়েছে যে, প্রজাপতি অগ্নে ছিলেন। এ
প্রজাপতি অর্থে দেবতা বা মহাশক্তি ধর। তিনি ইচ্ছে করেই
পরবর্তীতে দ্বিধা হয়ে, নারীও পুরুষ রূপে আবির্ভূত হন।
এভাবে সৃষ্টি কর্মের সুচনা। ঋষিদের নাসদীয় সূত্রের মতে, সৎ
বা অসৎ প্রজাপতি ছিলনা। ছিল শূণ্যবৃত্ত স্বশক্তি স্পন্দিত
অপ্রকট গভীর সলিল। উহারই শক্তি স্পন্দনে জন্ম হয় কাম বা
সৃজনেচ্ছা। সেই ইচ্ছারই পরবর্তী রূপ আকাশ, বাতাস,

দেবতা, পৃথিবী তথা সকল জীব । এভাবে সৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম দর্শন বিভিন্ন যুক্তি, বিভিন্ন উপাত্ত দিয়ে খাড়া করেছেন বিভিন্ন মতামত ।

বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ধর্মদর্শন তথা খ্রীষ্টানধর্ম ও ইসলাম ধর্ম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের অনেক পরে সৃষ্টি । তাই প্রাচীন চিন্তা চেতনার সাথে পরবর্তীতে প্রচারিত ধর্মমতের সাথে পার্থক্য রয়েছে । তবে ঋকবেদীর একেশ্বর বাদ পরবর্তীতে প্রচারিত ধর্মমতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে । প্রজ্ঞার সুস্পষ্টবিচার বিশ্লেষণে সৃষ্টি রহস্য এখানে উল্লেখিত হয়নি । সনাতনী চিন্তাধারার ঈশ্বরীয় মতবাদ পরবর্তীতে প্রচারিত ধর্মমতে বিভিন্ন যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । সাধারণ জ্ঞানীদের কাছে তা গ্রহণ করা সহজ ও বটে । তাই দ্রুত এমতবাদ সাধারণের মধ্যে গৃহীত হয়েছে । কিন্তু বৌদ্ধ চিন্তা চেতনার কথা হচ্ছে, আমার কর্ম নিয়ে যদি আমাকে স্বর্গে মোক্ষে যেতে হয়, তবে সেই মহান শক্তি ধরের দরকার কি ? আমার গাড়ীভাড়া বা পাথেয় থাকলে যেমন আমি দূর-দূরান্তে যান বাহন ব্যবহার করে গমন করতে পারি, তেমনি আমার কৃত পুণ্যফল বা লব্ধ পুণ্যফলে আমি স্বর্গ মোক্ষ লাভ করতে পারি । সুতরাং কল্পিত স্রষ্টার চেতনা এখানে নিরর্থক । মনে রাখতে হবে যে, আমার কঠোর সাধনায় বা অধ্যয়নে আমি যে কোন পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হতে পারি । তেমনি স্বকৃত কর্মের ফলে ব্যক্তি জীবনের চরম উৎকর্ষতা সাধন করতে পারেন । তাই বলা হয় বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন বাস্তবিক এক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন দর্শন । কোনরকম রাখ-ঢাক বা কারও কান দোহাই বা কার ও উপরনির্ভর করে কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই ।

বুদ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন-

তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অকুখতারো তথাগতা

পটিপন্নো পমোকুখন্তি ঝায়িনো মার বন্ধনা ।

অর্থাৎ নিজের উদ্যমে দুঃখ উৎপাতনের ব্যবস্থা করতে হবে ।
তথাগতগণ ধর্ম ব্যাখ্যাত মাত্র । এ মার্গাবলম্বী ধ্যানীগণ
মারবন্ধন হতে মুক্ত হন ।

এখানে বুদ্ধ বলেছেন, “আমি পথ প্রদর্শক মাত্র ।
ব্যক্তিকে সে পথে হাটতে হবে, যদি হাটাটা আমার প্রদর্শিত
পথে হয় তবে দুঃখ মুক্তি সম্ভব । আমি কারও দুঃখ উৎপাতন
করতে পারিনি ।” বুদ্ধের এ মহান দর্শনতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে,
আমার কৃতকর্ম আমাকে শেষ করতে হবে । বিশ্বের যে কোন
স্থানের যে কোন ব্যক্তি যদি মুক্তি লাভ করতে চান তবে তাকে
ভগবান বুদ্ধ প্রবর্তিত সম্যক অষ্টমার্গে বিচরণ করতে হবে ।
কোন পূজা, অর্চনায়, প্রার্থনায় বা দানযজ্ঞে কেউ মুক্তি লাভ
করতে পারেনা । তাই বুদ্ধের সুস্পষ্ট বাণী তিনি কারও
মুক্তিদাতা ও নহেন, দুঃখ দাতা ও নহেন । তা হলে, এখানে
প্রশ্ন হতে পারে আমরা কেন বুদ্ধকে এত ভক্তি বন্দনা করি?
বুদ্ধকে ভক্তি বন্দনা কারণ হচ্ছে বুদ্ধ জন্ম জন্মান্তরে অবিচলিত
চিন্তে সাধনা করে পারমী পূরণ করে মুক্তিজ্ঞান অর্জন করেছেন ।
তিনি অকৃত্রিম সাধনায় লাভ করেছেন এক অভিনব জ্ঞান, যে
জ্ঞানের নাম ‘বোধিজ্ঞান’ । বিশ্বের অপরাপর কোন ধর্ম দর্শন এ
মহান জ্ঞান লাভ করেননি ।

আমরা প্রাচীন ধর্ম দর্শন কাহিনী এবং বুদ্ধের পরবর্তী
ধর্মদর্শন কাহিনী অধ্যয়নে জানতে পারি যে, একমাত্র বুদ্ধই
কোন রকম যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া ধর্ম প্রচার করেছিলেন । তাঁর লঙ্ঘ

জ্ঞান প্রচারে তিনি সম্পূর্ণ মৈত্রী চিন্তে সেদিন সকল মতবাদ ও বিরুদ্ধাচারন কারীদের জয় করেছিলেন। এমনকি মদমন্ত নালগিরি হস্তী পর্যন্ত বুদ্ধের মৈত্রী বাণীতে সিদ্ধিহত হয়ে সিন্ত হয়েছিলেন। এমনি মহান গুণধরবুদ্ধ তথাপি বলেছেন, “আমি কারও পাপ মোচন করিনা। নিজেকেই উদ্যোগী হয়ে স্বকৃত কর্ম করতে হবে।” সুতরাং বর্তমান এ কম্পিউটার যুগে ব্যবহারিক ভাবে আচরণে তা সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে। আজ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কোয়ান্টাম মেথড, বিভিন্ন ধ্যানচর্চা কেন্দ্র তথা বুদ্ধ প্রদর্শিত পথের কিছুটা রদবদলে শান্তির পথ খোঁজা হচ্ছে। প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাচ্ছে তা’তে কিছুটা হলে উদ্ভিন্ন চিন্তা শান্ত হচ্ছে।

তাই বুদ্ধের ভাষায় বলা যায়-

অন্তাহি অন্তনো নাথো কোহি নাথো পরসিয়া?

অন্তনাব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।

অর্থাৎ নিজেই নিজের নাথ, তন্নিম্ন অপর কেহ কার নাথ? সুদান্ত ব্যক্তি নিজের মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করেন।

জগতের ধ্বংস ও পূর্নগঠন :

জগতের আদি বা সূচনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রাক আলোচনায় বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখন প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ বিশুদ্ধিমার্গের ‘সত্যদর্শন’ নামক অংশে জগৎ রহস্য সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। ‘সত্যদর্শন’ নামক গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠার বলা হয়েছে যে, পৃথিবী কল্প কল্পান্তর অগ্নি বায়ু এবং আপধাতুর দ্বারা ধ্বংস হয়, আবার পূর্নগঠিত হয়, বর্তমান কল্পের গোড়ার কথায় বলা হয়েছে যে, পৃথিবী যখন প্রলয় গর্ভ থেকে বিবর্তিত হয়, তখন

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

উহাতে কোন উদ্ভিদ ছিলনা। পৃথিবী পৃষ্ঠে সুস্বাদু ওজপপটি নামক খাদ্য স্বয়ং সৃষ্ট হয়েছিল। তখন ব্রহ্মলোক চ্যুত ব্রহ্মসত্ত্বগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা স্বয়ং প্রভ ও অন্তরীক্ষচর রূপে পৃথিবীর আদি অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের অন্তরে কোন লোভ বা কামনা বাসনা ছিলনা। কালান্তরে তাঁদের মধ্যে ওজপপটি সুস্বাদু খাদ্য মনে হল এবং তা খাবার লোভ হয়। ওজপপটি এমন খাদ্য যে যাকে মনে হত দুধের সরের মত সাদা এক প্রকার পদার্থ। এ শুষ্ক খাদ্য আদিবাসীরা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। এ সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণে ক্রমে তাঁদের মধ্যে কামরাগ সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁদের পূর্বের পুণ্য ঋদ্ধি চলে যায়। আগের মত যথা ইচ্ছা তথায় গমন করা বা আকাশ মার্গে বিচরণ বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বে এ ব্রহ্মসত্ত্বগণের মধ্যে স্ত্রী বা পুংলিঙ্গ প্রতীক গুপ্ত ছিল। কাম রাগের কারণে তাঁদের মধ্যে গুপ্ত ইন্দ্রিয় প্রকাশ পেতে শুরু করে। অথচ, পৃথিবীতে আগমন কালে তাঁরা গুপ্ত ইন্দ্রিয় স্বভাবে ছিলেন। সত্যদর্শন মতে ওজপপটি খাদ্য গ্রহণের লোভে তাঁদের পুণ্য ঋদ্ধি তিরোহিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, যখন গুপ্ত ইন্দ্রিয় প্রকাশ পায় তখন প্রথমেই স্ত্রী লিঙ্গ এবং পরে পুংলিঙ্গ স্বভাবের ব্রহ্মসত্ত্বগণ পৃথিবীতে বিচরণ করতেন। স্ত্রী লিঙ্গ প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল বলে স্ত্রীলোককে আদ্যাশক্তি বলা হয়। তাই পরবর্তীতে পৃথিবীতে দেবীর আরাধনা অত্যধিক বলে মনে করা হয়। ক্রমে ঐ ব্রহ্মসত্ত্বগণের মধ্যে কামতৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। তাই ওজপপটি নামক খাদ্য পৃথিবীতে তিরোহিত হয়। ক্রমে উৎপন্ন হয় শালী নামক তড়ুল। ঐ, তড়ুল ও বিনা পাকে খাওয়া যেত। ইহাই পৃথিবীর প্রথম উদ্ভিদ বলে মনে করা হয়। ক্রমে মানুষের কামনা বাসনা বৃদ্ধি পেতে

থাকে এবং ঐ তড়ুল ও তিরোহিত হয় । তাই মানুষ খাদ্যের জন্যে ক্রমে চাষবাস করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে বাস গৃহ নির্মিত হতে থাকে । পরবর্তীতে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় এবং মানুষ খাদ্যের জন্য চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । এভাবে জগতে ক্রমে বিবর্তনে মানুষের কাম তৃষ্ণাদির বৃদ্ধি হয় এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় । ক্রমে মানুষের আয়ু কমতে শুরু করে এবং ৯৬ প্রকার রোগের সৃষ্টি হতে থাকে । বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে ও মানুষের স্বীয় কর্মের কারনে পরে বিভিন্ন প্রাণীজগতের উৎপত্তি শুরু হয় । উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ চিন্তাধারায় যে দ্বাদশ নিদানের কথা বলা হয়েছে, তা এ মানুষের কৃত কর্মের কারণে সৃষ্টি । তৃষ্ণাতুর সত্ত্বগণ কর্মজ প্রভাবে সৃষ্টিকাল হতে এ দ্বাদশ চক্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে । কেননা, জাগতিক সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী সবই মানুষের আদি তৃষ্ণার কারণ ।

‘সত্যদর্শন’ অংশের ২৬ পৃষ্ঠা এবং সার সংগ্রহ গ্রন্থের (২য় খ-) ৩৪১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর আদি অধিবাসী ব্রহ্মসত্ত্বগণ পৃথিবী গঠনের পর মহাঋদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন । তাঁরাই আমাদের আদি বংশধর । তাঁদের মধ্যে ক্রমে তৃষ্ণার সৃষ্টি হওয়াতে পরবর্তীতে আমাদের এ জাগতিক অবস্থা । কাজেই বৌদ্ধ ব্যাখ্যায় কথা হচ্ছে ঐ আদি ব্রহ্মসত্ত্বগণ কার ও দ্বারা এ পৃথিবীতে প্রেরিত হননি বা কারও নির্দেশে আসেননি । কালান্তরের ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়াতে তাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন স্বয়ং প্রভ হয়ে । তাঁদের পঞ্চস্কন্ধ ধ্বংস বা নিরুদ্ধ হয়নি বলে তাঁরা পৃথিবী গঠনের পর পৃথিবীর আদি অধিবাসী হয়েছে । কোন অলৌকিক সত্ত্ব বা কর্তা বা সর্বশক্তিমান কোন ঈশ্বরের এখানে

কোন কাজ নেই। কল্প কল্পান্তরে অনাদি অনন্তকাল হতে এভাবে পৃথিবী গঠন এবং তা'তে প্রাণী সৃষ্টি হয়। কেউ এসে পৃথিবী বানিয়ে দেয় না বা প্রাণী সৃষ্টি করেনি। আপন স্বভাব গতিতে জগতের ধ্বংস ও পুনর্গঠন হয়। জগতের পুনর্গঠন সম্পর্কে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, জগতের পুনরুৎপত্তি কালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেই বারি বর্ষণে সমস্ত দক্ষ স্থান জলে পরিপূর্ণ হয় এবং জল ক্রমে নীচের দিকে যায়। ক্রমে উপরিভাগ কঠিনাকার ধারণ করে ভূমি ধাতু তৈরী হয়। ঐ সংবর্তন কালে পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম 'মহাবোধি পালংক' উৎপন্ন হয়। এ 'মহাবোধি পালংক' স্থান চিহ্নিত করবার জন্য সেখানে জন্ম নেয় পদ্মফুল। যদি এ সংবর্তকল্পে বুদ্ধ উৎপন্ন হবার থাকে। যদি বুদ্ধ উৎপন্ন হবার কল্প না হয় তবে নাকি ফুল ফোটেনা। কিন্তু বোধি পালংক থাকবে। পৃথিবীর এ গঠন প্রক্রিয়ায় পূর্বে যেখানে যেখানে, স্বর্গলোক ছিল সেখানে সেখানে স্বর্গলোক ব্রহ্মলোক সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে, তাবতিংস ও চতুমহারাজিক দেবলোক, পৃথিবী সংলগ্ন বিধায় এ দু'টি স্বর্গলোক পরে সৃষ্টি হয় বলে বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। জগতে স্বয়ং প্রভ মানবগণ ক্রমে তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ হয়ে সংসারের বা পরিবারের সৃষ্টি করে। জাগতিক খাদ্য গ্রহণে তাদের মধ্যে ৯টি দরজার সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে বিষ্ঠামূত্রের সৃষ্টি হয়। কামজগতের কারণে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস শুরু হয়। শালি ধান দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কার্য আরম্ভ হয়। ক্রমে চাষাবাদের জায়গা নিয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দের বা ঝগড়ার মীমাংসার জন্য একজন রাজার বা শাসকের প্রয়োজন হয়। তাই সবাই মিলে একজন ন্যায়বান বা শীলবান ব্যক্তিকে রাজা বা শাসক করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

সর্বসম্মত ভাবে জগতে আদি মানব ‘মনু’ কে রাজা করার সিদ্ধান্ত হয়। এ আদি মানব বা মনু হলেন বোধিসত্ত্ব। এ আদি মানবকে সর্বসম্মতভাবে পৃথিবীতে প্রথম রাজা করা হয়েছিল বলে তাঁকে ‘মহাসম্মত রাজা ও বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র সার সংগ্রহের ৩৫১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে-

“আদিচ্চ কূল সম্বুতো সুবিসুদ্ধ গুণাকরো

মহানুভাবো রাজাসি মহা সম্মত নামকো।”

অর্থাৎ অতীতের আদি পুরুষ সুবিশুদ্ধ গুণশালী মহানুভব ব্যক্তিতে ‘মহাসম্মত’ রাজা রূপে গ্রহণ করা হয়। এ রাজা অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনটি শংখ মুখে জল ঢেলে অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছিল।

জগতের ধ্বংসকালকে বলা হয় সংবর্ত কল্প এবং জগতে পূর্ণগঠন কালকে বলা হয় বিবর্তন কল্প। এ বিবর্তন কাল উৎপত্তির সূচনা হতে পূর্ণতা প্রাপ্তি কাল পর্যন্ত। এ জাগতিক প্রক্রিয়া বা জগতের স্বাভাবিক কার্যাদি প্রাকৃতিক নিয়মে গঠন ও বিবর্তিত হয়ে আসছে। এখানে কোন কারক বা প্রকৌশলী কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। কালের ঘূর্ণিপাকে লক্ষ কোটি বছর পরপর জগতের এ স্বাভাবিক কার্যক্রম চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। তাই বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথা হচ্ছে জগতের আদি নেই অন্ত নেই। অনাদি অনন্ত জগতের প্রবাহ ও অনন্ত।

এ বিশ্ব পরিমন্ডলে ধ্বংস সম্পর্কে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, জল, বায়ু ও অগ্নি এ তিনটি দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি একেক সময় এক এক উপাদান বা ধাতু দ্বারা ধ্বংস হয়। জলের দ্বারা পৃথিবী প্লাবিত

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

হয়ে সবকিছু লভভন্ড- হয়ে যেতে পারে । যেমন আমরা প্রবল বন্যা বা সুনামির কারনে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখি । এরকম প্রবল জল দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হবার যখন সময় আসে তখন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় । সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয় । এমনকি সুকিন্ন ব্রহ্ম লোকের নিম্নভাগ পর্যন্ত ধ্বংস হয় । বায়ু দ্বারা যখন পৃথিবী ধ্বংস হয় তখন বেহপ্ফল ব্রহ্মলোকের নিম্নভাগ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায় । পৃথিবীর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না । আর অগ্নি দ্বারা যখন ধ্বংস হয় তখন ‘আভস্মর’ ব্রহ্মলোকের নিম্নভাগ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায় । এ বায়ু, অগ্নি ও জল দ্বারা ধ্বংস কালে, পৃথিবীর সবকিছু এবং স্বর্গ লোক পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায় ।

বিভিন্ন শাস্ত্রে মহাপ্রলয়ের কথা আছে । বৌদ্ধমতে এ মহাপ্রলয় জল, বায়ু, অগ্নি দ্বারা হয়ে থাকে । তবে এ মহাপ্রলয়কালে প্রথম সাতবার অগ্নি দ্বারা অষ্টমবার জল দ্বারা আবার সাতবার অগ্নি দ্বারা এবং ষট্‌মবার জল দ্বারা মহাপ্রলয় হয় । এভাবে আটবার জলদ্বারা ধ্বংসের পর চতুষষ্টি বায়ুদ্বারা ধ্বংস হয় । এভাবে ধ্বংস হতে হতে নিম্নে অবীচি মহানিরয় হতে দ্বিতীয় ধ্যান ভূমি অপ্রমানভ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ধ্বংসকরে আভাস্মর ব্রহ্মলোক স্পর্শ করে । জল দ্বারা ধ্বংস শুরু হলে জল অবীচি থেকে তৃতীয় ধ্যান ভূমি শুভাকীর্ণ পর্যন্ত স্পর্শ করে । বায়ু দ্বারা ধ্বংসকালে বায়ু অবীচি হতে চতুর্থ ধ্যানভূমি বৃহৎফল ব্রহ্মলোক পর্যন্ত স্পর্শ করে ।

এভাবে কল্প কল্পান্তরে জগত মহা প্রলয় বা মহা দুর্যোগের সম্মুখীন হয় । কালের পরিক্রমায় জগৎ আবার স্বমহিমায় স্ববীতি নীতিতে পূর্ণগঠিত হতে শুরু করে । জগতের

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

এ ধ্বংস ও গঠন প্রক্রিয়া বাস্তবিকই চিন্তার ও গবেষণার বিষয়। কিন্তু, এর কোন সঠিক সমাধান মিলেনা। যদি ও Big Bang Jheory তে বলা হয়েছে জগতের সূচনা হয়েছিল ১ হাজার ৩৮০ কোটি বছর আগে। মহাশূন্যে রশ্মির বিকিরণের উপর গবেষণা করে ইউরোপীয়ান বোপস মহা শূণ্যায়ান প্লাংক থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তা ও সঠিক বলে এখনও গৃহীত হয়নি।

এছাড়াও বর্তমানে চন্দ্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ তথা বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে অনুসন্ধান পূর্বক এবং তথাকার মাটি পাথর ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। তাছাড়া, আবিষ্কৃত হচ্ছে শত শত গ্রহ পুঞ্জ। বিভিন্ন অনুসন্ধান ও তত্ত্ব উপাত্ত নিয়ে নিয়ে ও বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর সৃষ্টির মূল বিষয় বা সৃষ্টির সূচনা আবিষ্কার করতে পারেন নি। আদৌ কোনদিন আবিষ্কার করা সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। বুদ্ধ অনন্ত অসংখ্য চক্রবালের কথা বলে গেছেন। আজ বৈজ্ঞানিকেরা তা ক্রমে অনুধাবন করছেন। বুদ্ধ যেমন বলেছেন, জগতের আদি নেই - অন্ত নেই, ঠিক তেমনি বৈজ্ঞানিকদের ও বলতে হবে যে, জগতের আদি নেই - অন্ত নেই। ইহা ছিল আছে এবং থাকবে। প্রাকৃতিক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কার্যক্রম চলতেছিল চলতেছে এবং চলতে থাকবে। কোন স্রষ্টা বা শক্তি ধরের কাজ এ প্রক্রিয়ায় নেই। আছে শুধু কার্য কারণ প্রক্রিয়া বা Law of causation বা হেতু প্রত্যয় ধর্ম। যা স্মরণাতীত কাল হতে চলে আসছে।

শেষ বক্তব্য :

জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। বর্তমান যুগে সাধারণত মানুষের আয়ু ৭০/৮০ বছর। এ সময়ের মধ্যে সত্যকে জানা দরকার। কিন্তু এ বিশ্ব চরাচরে কতজনেই বা এ সত্যকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করে? প্রাচীনকাল থেকে জীবন প্রক্রিয়া নিয়ে মাত্র গুটি কয়েক জ্ঞানীগণ সত্য তত্ত্ব জানার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ও অধিকাংশ ছিলেন সৃষ্টিকর্তা নির্ভর এবং, তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা ও কামনা প্রার্থনার ধর্ম। আড়াই হাজারাবধি বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ একান্ত স্ব নির্ভর এক ধর্ম প্রচার করে গেছেন। তিনি যে জ্ঞান বা বোধি লাভ করেছেন তা একান্তভাবে তা স্ব প্রচেষ্টার ফসল। কোন রকম ঐশ্বরিক বা অলৌকিক বা কারও নিকট প্রাপ্ত ধর্ম দর্শন, নহে। পরবর্তীকালের ধর্মপ্রচারক বৃন্দ ও ঈশ্বর নির্ভর বা শ্রষ্টাকেন্দ্রিক ধর্ম প্রচার করেছেন। কিন্তু বুদ্ধ মধ্যে খানে এমন এক ধর্ম প্রচার করেছিলেন যা একান্ত আত্মনির্ভর।

বুদ্ধ মহা জ্ঞানী একারণে যে, তিনি জগতের আদি অন্তের কথা ব বলেননি। কেননা, তা'তে প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে যায়। সমাধা হয়না। তেমনি প্রাণী জগতের জীবন প্রক্রিয়া নিয়ে ও বুদ্ধ অনাদি অনন্তকালের কথা বলেছেন। তবে বিশ্ব জগতের প্রজ্ঞাবানদের আশ্বাসের বিষয় যে, বুদ্ধ জীবন প্রক্রিয়া নিরুদ্ধ করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ স্থায়ী প্রচেষ্টায় অনন্তকালের দুঃখময় জীবন প্রক্রিয়া নিরোধ করা সম্ভব। ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের চমকপ্রদ অধ্যায়। ইহাই আশার বাণী। কারণ, জন্ম জন্মান্তরের চলমান জীবনে দুঃখই বেশী। তাই এ প্রক্রিয়া নিরসন করা, প্রয়োজন। বুদ্ধ বলেছেন, ইহা কোন শ্রষ্টা বা কর্তার কাজ নহে। নিজেকে ইহা নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিরসনের পথে অগ্রসর হতে হবে।

বুদ্ধ চিন্তার কথা হচ্ছে জন্ম মৃত্যু হচ্ছে ভবাঙ্গকৃত্য মাত্র । জন্নোর সূচনা রূপে যে চিন্ত প্রতীসন্ধির পর ভবাঙ্গ প্রবাহ মনের অবচেতনান্তর চলতে থাকে আজীবন । এর প্রবর্তনকে বলা হয় ভবাঙ্গ কৃত্য এবং মরনাসন্ন সময়ে এ ভবাঙ্গ প্রবাহ অন্তিম চিন্তের আলম্বন ত্যাগ করলে মৃত্যু হয় । যাকে চ্যুতি কৃত্য ও বলা হয় । উল্লেখ্য যে, প্রতীসন্ধি যেমন জীবনের প্রথম চিন্তক্ষণ, চ্যুতি বা মৃত্যু মানব জীবনের আগমন নির্গমন হয়ে থাকে । কিন্তু জীবন শ্রোত প্রবাহমান থাকে । একেই বুদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন । কারণ ভবাঙ্গ চিন্তের চ্যুতি হয় বটে, কিন্তু কর্মজ শক্তি বা কৃত কর্মের ফল শেষ হয় না । জাগতিক দেহের পতন ঘটে বটে, কিন্তু চিন্তজ কর্মের প্রবাহ বিরামহীন ভাবে চলতে থাকে । আমরা যাকে মৃত্যু বলি তা কিন্তু দেহের রূপান্তর মাত্র । একটা দেহ পরিবর্তন করে অন্য দেহে সংক্রমণ ক্রিয়ামাত্র । এ সংক্রমণ প্রক্রিয়াই ভবাঙ্গ প্রক্রিয়া বা চিন্তজকর্ম । ইহাকে জন্ম মৃত্যুর উপাদান ও বলা যায় । সুতরাং, আমরা যাকে মৃত্যু বলি তা কিন্তু নয় । কেননা, মৃত্যু আসলে পর জন্নোর সূচনা করে মাত্র । শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে মৃত্যু হচ্ছে-

“খন্ধা নিরুজ্জাতি চ চখি অচঞত্তা

খন্ধানং ভেদো মরন্তি বুচ্চতি ।

তেসং খয়ং পস্সতি অল্পমত্তো,

মণিং বা বিজ্জং বজিরেন যানি সোতি ।”

অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধেরই লয় হচ্ছে বা পঞ্চস্কন্ধ বিনষ্ট হচ্ছে । কোন জীব বা মানুষ মরছেন না । পঞ্চস্কন্ধের ভেদই মরণ বলে কথিত হয় । হীরকে দ্বারা মণি বিদ্বের ন্যায় অপ্রমত্ত ভিক্ষু ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানে পঞ্চস্কন্ধের লয় বিলয় নিরীক্ষণ করেন । পঞ্চস্কন্ধের লয়

বিলয়ই হয়। ইহাকে আমরা সাধারণেরা মৃত্যু বলি। লোকুত্তর জ্ঞানে সেদিনই আসল মৃত্যু হয় যেদিন ব্যক্তির তৃষ্ণা ক্ষয় জ্ঞান হয়। যে জ্ঞানে তিনি জাগতিক সকল মোহ ছিন্ন ভিন্ন করে তৃষ্ণার নিরোধে বাধ বা বাধার সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন-

“গৃহ কারকং দিট্ঠেঠাসি, পুন গেহং না কাহসি”

অর্থাৎ হে গৃহ নির্মাতা তোমাকে আমি দেখেছি, তুমি আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। এখানে তিনি যে গৃহ কারকের কথা বলেছেন, সেই গৃহ কারক হচ্ছে ভবাস্গ চিত্ত বা জন্ম মৃত্যুর চিত্তজকর্ম। বোধিজ্ঞানে এ চিত্তজ কর্ম প্রবাহকে রুদ্ধ করতে পারলেই জীবন প্রক্রিয়া শেষ হয়। নচেৎ জীবন প্রক্রিয়া অনাদি অনন্ত কাল ধরে চলতেই থাকবে।

অতএব বলা যায়, আমি নিজেই আমার সৃষ্টিকর্তা। অনাদি অনন্ত কাল ধরে আমি আছি, ছিলাম এবং থাকব। যদি না আমি আমার আমিত্বকে বা ভবাস্গ প্রক্রিয়ার পথ বন্ধ করতে না পারি। কোন স্রষ্টা কোন দেবতা, কোন ব্রহ্মা বা কোন শক্তিমান আমার ভবাস্গ প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেন না। আমাকেই আমার চিত্তজ ক্লেশ ধ্বংস করে নিজেকে পরিশোধন করতে হবে। কেউ আমার ক্লেশ বা মনের ময়লা পরিষ্কার করতে পারবেনা।

তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

জলেন ভবতি পঙ্কং জলেন পরিসোধতি,

চিন্তেন করোতি পাপং চিন্তেন পরিসোধতি।

অর্থাৎ জল মাখা কাদা পরিষ্কার করতে যেমন পরিষ্কার জল লাগে, তেমনি চিত্ত দ্বারা কৃত পাপ বা চিত্তজ কর্ম পরিষ্কার

করতে হবে চিন্তা দিয়েই। কামনা বা প্রার্থনা করলে এখানে কেউ এসে চিন্তের ময়লা পরিষ্কার করে দেবেনা।

অতএব, বৌদ্ধ প্রক্রিয়ার কথা হচ্ছে শ্রুতি, সৃষ্টি এবং জাগতিক কর্মকান্ড অনাদি কাল থেকে আছে। তবে কামভূমির মধ্যে মনুষ্য লোকের অবস্থান সবার উপরে। কেননা, এ লোকে অবস্থান করেই মানুষ পাপ বা তৃষ্ণায় ক্ষয় করতে সক্ষম হন। অন্যকোন ভূমি বা স্বর্গ ব্রহ্মলোকে অবস্থান করে চিন্তের ক্লেশ ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তাই আমার সৃষ্টি কর্তার খোঁজ করে তার কার্যক্রম নিরুদ্ধ করা জরুরী। বৌদ্ধ দর্শনে ইহা সম্ভব। তাই বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

কিচ্ছো মনুস্স পটিলোভো কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং

কিচ্ছং সদ্ধম্মসবণং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো।”

অর্থাৎ মানব জীবন লাভ করা খুবই কষ্ট সাধ্য, মানবজীবন বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন, বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ বা প্রাপ্তি আরো কষ্ট সাধ্য এবং জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব সহজ নহে।

আমরা যেহেতু সদ্ধর্ম পেয়েছি, সেহেতু সদ্ধর্মের সম্যক আচরণে আমার শ্রুতিকে আমি ধ্বংস করতে পারি। ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের আশ্চর্যের বিষয়।

মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে আমরা পরম ভাগ্যবান এবং বুদ্ধের ধর্মদর্শন পেয়ে আরো সৌভাগ্যবান। তবে কথা হচ্ছে, আমরা সদ্ধর্ম আচরণ করছি কিনা বা সদ্ধর্মের অনুসরণ করছি কিনা তা পর্যালোচনা করা কর্তব্য। যেহেতু মানব জন্ম দুর্লভ এবং বুদ্ধের ধর্ম দর্শন পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তাই বর্তমান জন্মে আমরা পরম সৌভাগ্যবান। কেননা, বুদ্ধের মুক্তির পথ পেয়েছি। যে পথ অনুসরণে আমরা ক্রমে কর্মক্ষয় করে জীবন

বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টিকর্তা

প্রক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করতে পারব। তাই জগতে বুদ্ধের শরণ খুবই উত্তম শরণ। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে-

এতং খো সরণংখেমং, এতং সরণং মুত্তমং

এতং সরণামাগম্মা সব্বা দুক্খা পমুচ্চতি।

অর্থাৎ বুদ্ধের শরণ নিরাপদ, বুদ্ধ জ্ঞানের শরণ ক্ষেমংকর এবং শ্রদ্ধাভরে বুদ্ধের শরণে সর্বদুঃখ থেকে বিমুক্ত হওয়া যায়। তাই আসুন সকলে একসাথে বলি-

‘বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।’

পরিশেষে, এটুকু বলব, আমার সামান্য ও ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জ্ঞানে জগৎ ও বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকাদি অধ্যয়নে যে তত্ত্ব পেয়েছি, তা সামান্য উল্লেখ করেছি। আমি কোন দার্শনিক, পণ্ডিত ও গ্রন্থকার নই। বৌদ্ধধর্মে সৃষ্টি কর্তা বলতে কাকে বুঝায় তা সামান্য আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। জাগতিক জীবনে দেখেছি, অনেক বৌদ্ধ ও কল্পিত ঈশ্বর বা ভগবানের উপর নির্ভরশীল। তাই ভ্রান্তি নিরসনে এবং বৌদ্ধমতে আসলে সৃষ্টিকর্তা কে তা সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে সাধারণ ভাষায় পর্যালোচনার চেষ্টা করেছি। শিক্ষকতা জীবনেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য ও মন্তব্য থেকে ভগবান বলতে সৃষ্টিকর্তার নিকট নিবেদন করতে দেখেছি। তাই বৌদ্ধ চেতনায় আসলে ভগবান বা সৃষ্টিকর্তা বা পরম শক্তিধর কে তা পর্যালোচনার চেষ্টা করছি।

“জগতের সকল সত্ত্বগণ সুখী হোক”।



তথ্যসূত্র :

১. বিশুদ্ধি মার্গ ও বৌদ্ধ সাধনা - প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু
সম্পাদিত দ্বিতীয় অধ্যায় ।
২. সার.সংগ্রহ ২য় খন্ড ৩৪১ পৃ., শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির ।
৩. সদ্ধর্ম বিশুদ্ধি রত্নমালা, শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্থবির, ৫৪৬
পৃ. ।
৪. মধ্যম নিকায়, ২য় খন্ড, শ্রীমৎ ধর্মধার মহাস্থবির ।
৫. বিপস্সনা চরিয়া, ভদন্ত স্মৃতিমিত্র থের ।
৬. দীর্ঘ নিকায় ।
৭. অঙ্গুত্তর নিকায় ।
৮. সংযুক্ত নিকায় ।

সমাপ্ত





পরিবেশনায় :
কুশলায়ন প্রকাশনা পরিষদ